পলাতক

সিগ্‌নেট প্রেস

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা

শ্রীমান স্থকুমার মজুমদার পরম স্নেহাস্পদেষু

নিবেদন

এই উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকারা সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক।

উদ্ধৃত কবিতাগুলির বিষয়ে ঋণ-স্বীকার করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি নিজের বিশিষ্টরূপে উজ্জ্বল।

"রাজকন্যা" কবিতাটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দি কবিতা "অঞ্চল" কবির "লাল চূণর" থেকে নেওয়া।

"কাজর বদরিয়া" পথ চলতে শ্রুতিতে আটকে যাওয়া পুরনো কজরী।

—শচীন্দ্র মজুমদার

২৫শে বৈশাখ ১৩৫৪ : "সিলভর ওক্‌স্" : ল্যাকর রোড : এলাহাবাদ

সিটি রোডের চৌমাথায় তখনো কঙ্কালসার পুলিশ-লরিটার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। ভস্মস্তূপ থেকে অলস ধোঁয়ার সর্পিল রেখা উঠছে আকাশ পানে। কমলা শহর ঘুরে লরিটাকে দেখতে এসেছিলো। শহরে নানা আবর্জনা চারিদিকে। টেলিগ্রাফের কাটা তারগুলো গুটিয়ে জট পাকানো, লোহার থামগুলো যেন একটা দৈত্যের দল তুমড়ে রেখে গেছে। গাড়ি চলাচলের পথ নেই, পথচারীরা চলেছে বাধাগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। মোড়ে মোড়ে বন্দুকের ওপর সঙ্গীন খাড়া ক'রে জাঠ-সৈনিকের পাহারা। কমলার চোখের সামনে বাঙালী এক অফিস-যাত্রী অকারণে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার ধারা দুটি প্রকাশ্য, অন্তঃশীলা সরস্বতী যেন আত্মপ্রকাশ করেছিলো সেই লোকটির দেহনিঃসৃত রক্তস্রোতে। ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে কমলা সে-দৃশ্যটা দেখেছিলো, কিন্তু তর সয়নি তার কিছু করবার। লরিটা তার মন টানছিলো। ছিলো তাতে তার আগুনের মায়া, কারণ সে নিজে

তাতে অগ্নিসংযোগ করেছিলো। মায়া সেই জন্যই—নিজের হাতের কাজের অটুট মায়া, যে-মায়া শিল্পীর, যে-মায়া মনের ছবি পটে ফুটিয়ে তোলার, যে-মায়া নিজের করা ধ্বংস আর সৃষ্টিতে এক।

তার সঙ্গী ছিলো অনেক, তাদের কেউ কমলার পরিচিত নয়। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মতো লরিটা জ্বললো। অনেকগুলি হাত গাড়িটার পেট্রোল-ট্যাঙ্ক থেকে তেল বার ক'রে সেটাকে সিক্ত ক'রে দিলে। কমলা কাছেই ছিলো, তার শাড়ির রাঙা পাড় শিখার মতো জ্বলছিলো সেই ভাদ্রদিনের রৌদ্রপ্রখর দুপুরবেলায়। একটি ছেলে তার হাতে একটা মশাল গুঁজে দিয়ে বললে, শিখাস্বরূপিণী, তুমিই দাও আগুন, সে-আগুন সবখানে ছড়িয়ে যাক, দাসভূমি ভারত শ্মশান হয়ে যাক জ্বলে পুড়ে। মৃত্যু যেমন জন্মের অগ্রদূত, তেমনি সেই শ্মশান থেকে উত্থিত হোক নবজীবন, আসুক নূতন প্রবুদ্ধ ভারত।

কমলা মেয়ে। তার স্বভাব ধারণ করা, গঠন করা, চয়ন ক'রে সংহতি ঘটানো। ধ্বংস করা তার কাজ নয়। নিমেষের জন্য তার বুক কেঁপে উঠলো। পরক্ষণে সে তুলি বোলানোর মতো লরিটার সর্বাঙ্গে মশালটা বুলিয়ে দিলে, যেন তার আপন শিখা জ্বলে উঠলো লেলিহান হয়ে। দিন দুপুরেও আগুনের ছায়া পড়লো কাছের ছাত্রাবাসটার দেওয়ালের গায়ে। বর্ষায় ঘাস জেগেছিলো রাস্তার ধারে, তাপে সেগুলো দগ্ধ হয়ে গেলো। শিখায় উঠলো স্ফুলিঙ্গ। দাহনের শব্দ আছে, আগুনেরও আছে ভাষা, সেই

ভাষাও জাগলো। কমলা দেখতে লাগলো নির্নিমেষ নেত্রে, যেন শুভদৃষ্টির দেখা সে, যে-দৃষ্টিতে বিস্ময় আশা কৌতূহল, মনের ঝাঁপি খুলে দেওয়া। মনের নেশায় কমলা দেখলে, দেশ আজ দয়িত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সমুখে। এ বিরাট দীপশিখা বরণে মেতেছে, সে-বরণ দেখছে বধূ কমলা নিজে। আগুনের ভাষা নয়, যেন অগ্নিদেবেরই পড়া বিবাহ-মন্ত্র। কমলা ভাবছে যেন সে-মন্ত্র এখনি তাকে বিবাহের হোমানলে আহুতি দেবে। এখনি যেন ডাক আসবে, এসো কমলা। তারপর সম্প্রদান, মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে—এণাং সাভরণাং স্বালঙ্কারাং কন্যাম্ ত্বম্—মন্ত্র ফুরোবার আগেই দয়িত ভারত যেন সাগ্রহে দুটি বাহু বাড়িয়ে উদাত্ত স্বরে বলে ওঠে—প্রতিগৃহ্ণামি। নিলুম তোমাকে, শিখা-স্বরূপিণী, দয়িতা সেবিকা মাতা—নিলুম তোমাকে ভারতের আশা ক'রে, সর্বস্ব ক'রে। কমলার চিত্তে বিবাহলগ্নের গোধূলি বেলা লুকিয়ে ছিলো। এ যেন বিবাহের রঙে রাঙা বিচিত্র দিবা গোধূলি। নূতন উপলব্ধির আবেশে কমলার চোখ বুজে গেলো, তার বুক দুরুদুরু ক'রে কেঁপে উঠলো।

দুদিক থেকে পুলিশের গাড়ি হুড়মুড় ক'রে এসে দাঁড়ালো একটু দূরে। কড়কড় ক'রে বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো। পূর্বদিনে কাছারির সামনে গুলি-চলার অভিজ্ঞতা ছিলো কমলার। সে ধুলোয় শুয়ে পড়লো। মাথার উপর দিয়ে গুলির কয়েক ভলি বয়ে গেলো। জয়নিনাদ এলো তার কানে, কে তা করলে, কে পড়লো তা

কমলার আর খেয়াল রইলো না। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে যেতে সে দেখলে সামনে একটা মোটা সেগুন গাছ, তার পিছনে আশ্রয় নিলে। একটু দূরে আর একটা, তারপর আর একটা। কমলা বুক ভরে শ্বাস নেয় আর নিচু হয়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় বদল করে। ওপাশে একটা জলবাহি পরিখা, তাতে কাদা শুকিয়ে ফাটা মাটি কাঠ হয়ে গেছে। কমলা তার ভিতর নেমে পড়লো। মাথার চেয়েও উঁচু মাটির পাড়, তাকে আর দেখা যায় না রাস্তা থেকে, তবুও সে-আশ্রয় নিরাপদ নয়। দু'পা এগোতেই একটা বাঁধানো কলভর্ট তার নজরে পড়লো, তার ভিতর ভিজে মাটি। ভিতরে ঢুকে সে অন্ধকার গহ্বরে লুপ্ত হয়ে গেলো। উপরের পদশব্দের মৃদুধ্বনি কলভর্টটার ভিতর। গর্তের মুখ থেকে দূরের শব্দ এলো, কে যেন ডাকলে কম্‌লা ব'লে। সে আরো ভেতরে গেলো। সেখান থেকে দূরবীনের প্রান্তের মতো নালীর মুখের উদ্ভাসিত আলোয় দেখতে পেলে খাকি পোশাকপরা অনেকগুলো মানুষের অঙ্গ। বুক কেঁপে উঠলো তার। মনে হলো, কতো না পদচিহ্ন সে নালীটার আশপাশে, মুখে রেখে এসেছে। পরক্ষণেই মনে হলো, না, রেখে আসেনি। তার পা থেকে জুতো খসে পড়েছিলো কখন কে জানে। ফাটল মাটি তীক্ষ্ণ হয়ে তার পায়ে বিঁধেছিলো। মনে পড়ে গেলো কাঁটার মতো ছোট একটা শুকনো কাঁকর ওখানে তার পায়ে ফুটেছিলো, আর সে কলভর্টের খিলান ধ'রে দাঁড়িয়ে পা থেকে কাঁকরটা তুলেছিলো। নালীর মুখে একটা লোক হাঁটু

মুড়ে বসলো, তার লাল পাগড়িটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আর সে কাঁধে বন্দুক রাখলে। কমলা কাদার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো, দেহ তার কাদায় খানিকটা ডুবে গেলো। সুড়ঙ্গটার ভেতর ইন্দ্রের ভাণ্ডার খালি ক'রে বজ্র হানা দিয়ে উঠলো, আবদ্ধ শব্দের বিপুল গুঞ্জরণ তাকে বধির ক'রে দিলে। ছর্‌রাগুলো দেওয়ালে ব্যাহত হয়ে কর্দমাক্ত মাটিতে তাপ-জুড়ানো শ্বাস ফেলে মিলিয়ে গেলো।

তবুও আশ্রয়টা নিরাপদ। অন্ধকার? হোকগে অন্ধকার। এই তো নূতন অন্ধকার জীবনযাত্রার আরম্ভ! না জানি এর শেষ কোথায়, সরকারী বন্দীশালায় অথবা জগতের গহন বনে! কমলার মন বলছিলো, তার বাইরে থাকার দিন ফুরিয়ে গেছে, তার অদৃষ্টে আর নিরাপদ জীবনযাত্রা সম্ভব নয়।

সুড়ঙ্গটার ভিতর গভীর রাত্রি কেবল ও-প্রান্তে আলোর একটা বড়ো বিন্দু, তাইতে শুধু প্রাণের আশ্বাস। ভিতরে কাল স্থির হয়ে গেছে, তার যেন গতি নেই। কমলা সুড়ঙ্গটার ইট-বাঁধানো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে আলোকবিন্দুটাকে দৃষ্টি দিয়ে অবলম্বন ক'রে রইলো, তার মনে আনমনা ভাবনা কিন্তু দৃষ্টি আবদ্ধ সেই আলোর কেন্দ্রটুকুতে।

অবশেষে সুড়ঙ্গ-মুখেও ছায়া নামলো। কমলার চেতনা হলো বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে, এইবার নেমে আসবে রাত্রি। মনে পড়ে গেলো সন্ধ্যায় শাঁখ বাজানোটা তার কাজ, ভালো লাগতো তার

শাঁখ বাজাতে। কে জানে সেদিন তাদের বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হলো কি না, তার মা গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীপ্রণাম করছেন কি না! এ বিষম আশ্রয়ে রাত্রি তার মনে ভয় ডেকে আনলে। অন্ধকার হলেও আগে দূরবর্তী আলোর আশ্বাস ছিলো। সূর্যালোক-ভয় নিবারণ করে। রাত্রি, বিশেষ ক'রে এমন স্থানের রাত্রি ভয়ের জন্মদাত্রী। কমলা মনে মনে অনেক অজানার আগমন অপেক্ষা করতে লাগলো, অচেনা বিচিত্র অনেক রাত্রির শব্দের দিকে কান পেতে রইলো। পায়ে একটা কি পোকা কামড়ালো, ভাবলে কাছেই যেন সে সাপের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। পা'টা সামান্য একটু জ্বালা করতে লাগলো। উঠে দাঁড়াতেই ওপরের ছাতে তার মাথা ঠুকে গেলো; ক্ষণিকের জন্য মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো। মাথাটা ঠিক হতেই জ্বালার উপলব্ধিটা ফিরে এলো। কিসে যেন সে পড়েছিলো বিষাক্ত সাপের দংশনের ফল দশ মিনিটেই টের পাওয়া যায়। সে এক দুই ক'রে সেকেণ্ড মিনিট গুনতে লাগলো, গোনার মাঝেই মনে করলে এ-সময়ে স্থির হয়ে থাকার কথা, নড়াচড়ায় বর্ধিতগতি রক্তস্রোত বিষ ছড়ানোর পক্ষে মারাত্মক। সে দেহ নিচু ক'রে আড়ষ্ট কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ছ'শো সংখ্যা গোনার তন্ময়তা শেষ হতেই দেখলে জ্বালাটা আর নেই। কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণা পেয়েছে। আর নয়, আর এখানে থাকা নয়। পুলিশ ধরলেও আর যাই করুক স্ত্রীলোক ব'লে অন্ততঃ জল নিশ্চয়ই খেতে দেবে। কমলা সুড়ঙ্গের বিপরীত মুখের

দিকে এগোল, দিকনির্ণয় করতে লাগলো দেওয়ালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। ভাবলে, জলনিকাশের নালী, একটা মুখ আছে যেকালে, অন্য মুখটাও থাকবেই। চলেছে সে যেন ক্রোশের পর ক্রোশ, চলা আর শেষ হয়না। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, তার মাথার উপর থর্নহিল রোড, চওড়া হলেও তেপান্তর মাঠ নয়, নালীটার শেষ আছেই। কুঁজোর পিঠের মতো দেওয়ালে একটা বাঁক, ইটের গাঁথুনির স্পর্শেই তার খাড়া বিভাজন রেখাটা বোঝা যায়।

বাঁকের মুখেই তার গায়ে শীতল ভিজে হাওয়া এসে লাগলো এক ঝলক। কমলা আরামের শব্দ ক'রে হাঁ ক'রে রইলো একটু-ক্ষণ। এক পা এগোতেই তার পা ছপ ক'রে অতি ঠাণ্ডা জলে প'ড়ে গেলো, সারাদেহ তার সে-স্পর্শে শিউরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে পিপাসাও হলো অসহ্য। জলে তখন তার পা ছুটি গোড় পর্যন্ত ডুবে গেছে। হাঁটু গেড়ে ব'সে জলপৃষ্ঠে মুখ দিয়ে পশুর মতো সে আকণ্ঠ জলপান করলে। আগে তার ব্যাসিলির ভয় ছিলো। এখন কোথায় ব্যাসিলি পোকামাকড়, সে-চিন্তা তার মনকে ছুঁলেও না। হয়তো বা জলটা ব্যাঙাচির রাজত্ব। সেই রকমই একটা কিছু কমলার গালে স্পর্শ দিয়ে গেলো।

উঠে দাঁড়াতেই আবার বাতাসের ঝলক লাগলো এসে। পায়ের নিচে ঠাণ্ডা জল, ওপরে জলসিক্ত শীতল বাতাস, কমলার আর সে-স্থানটা ত্যাগ করতে ইচ্ছা করছিলো না। সে জামা খুলে বুক উন্মুক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, জুড়িয়ে গেলো দেহ। হঠাৎ তার

মনে হলো, এই জলেই অবগাহন করিনা কেন! কাপড় খুলতে খুলতে হাসি এলো ময়লা হবার ভয়টা মনে পড়ে, তার বেশভূষার বাবুআনা ছিলো। মনে পড়লো না আর তার শাড়ির কি পাড়, ব্লাউসের কি রঙ। তবুও সংস্কারবশে সে একহাতে শাড়ি জামা অধোবাস উঁচু ক'রে ধ'রে জলে গড়াগড়ি দিলে। এ অভিনব বিলাসের পর আঁচলে দেহ মুছে কাপড় প'রে আবার এগোল।

ঝম্‌ঝম্, বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ তার কানে এসেছিলো মধুর হয়ে। হঠাৎ বৃষ্টি তার আপাদমস্তক ডুবিয়ে দিলে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, মাথার উপর দুটি বাহু তুলে কমলা অনুভব করলে আর বাধা নেই, দু'পাশে হাত বাড়িয়ে দেখলে দেওয়ালও নেই। অন্ধকার একটু স্বচ্ছ হয়ে এলো। জুড়ানো দেহ নিয়ে সে ঢালু জমিতে উঠতে উঠতে দেখতে পেলে সামনে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি। অনুভব করলে পায়ের তলায় ঘাস-ছাওয়া মাটি। ঘাসের ছোঁওয়া কি মধুর! বিদ্যুৎ হানছিলো ক্ষণে ক্ষণে। ঢালু জমির উপরেই হাতা-ঘেরা জাফরিকাটা দেওয়াল। সেটা ধ'রে দাঁড়াতেই একটা বিরাট বাড়ির কাঠামো কমলার নজরে পড়লো। বাড়িটার গায়ে অনেক আলোর উজ্জ্বল বিন্দু। মনে পড়ে গেলো সেটা ছাত্রাবাস, কতো সঙ্গী আছে তার ওখানে। কোনো ক্ষণেই কমলার মতিবিভ্রম হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হলো ও-ছাত্রাবাসে পাঠসঙ্গী তার দু'চারজন, কিন্তু তার প্রেমিক প্রত্যেকে। তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

ফটকের কাছে পোড়া লরিটা, সেটা ঘুরে যাওয়ার বিপদ আছে। সে ও-পথে গেলো না। একবার বিদ্যোৎস্ফুরণে পাঁচিলটা দেখে নিয়ে কমলা সেটা পার হয়ে হাতার ভেতরে নামলো আর গাছের আড়ালে আড়ালে একেবারে ছাত্রাবাসটার কিনারায় গিয়ে উপস্থিত হলো। বারান্দাটা নির্জন; কোণের ঘরটার দরজা খোলা, ঘর থেকে আলোর রশ্মি এসে পড়েছে বাইরে। সে নিঃশব্দে বারন্দায় উঠে ঘরে উঁকি মারলে। যার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল তার নাম দয়ানন্দ্। দয়ানন্দ্ এক লাফে বিছানা থেকে উঠে এলো, বিস্মিত স্বরে বললে, আপ? জলদি আইয়ে অন্দর। কমলা ভিতরে যেতেই সে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। দরজার কাচে সবুজ রঙ লাগানো, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

দয়ানন্দ্ বালিয়ার ছেলে। মাস্টার ছাত্র সকলে জানে বালিয়ার ছেলেগুলো দেহে মজবুত, পড়ায় একগুঁয়ে, কিন্তু আচরণে চোয়াড় আর সাধারণ বুদ্ধিতে গাধা। অন্য জেলার ছেলেরা তাদের পরিচয় দিতে বিশেষ একটা কথা ব্যবহার করে--উজড্, যার মানে বন্য। কমলাও দয়ানন্দ্‌কে প্রচণ্ড একটা গাধা ব'লে জানতো। কমলাকে দেখলেই সে হাসতো। কালেজে কোয়ডর্যাঙ্গেলের ওধারে দয়ানন্দের এম-এ'র অঙ্কের ক্লাশ, এধারে কমলাদের ফিজিক্স ল্যাবরেটরি। ল্যাবরেটরির কাছাকাছি অ্যারিকা পামপুঞ্জের তলা থেকে দয়ানন্দের হেঁড়ে গলায় গান ভেসে আসতো, মুঝে দম দে

কে সৌতন ঘর যানা। কমলা জানতো ও-গানটা তাকেই লক্ষ্য ক'রে। এম-এসসি ক্লাশে কমলা ছাড়া ছাত্রী ছিলোনা আর কেউ। তার পাশ দিয়ে যাবার সুযোগ পেলে দয়ানন্দ্ নানা টিপ্পনী ক'রে যেতো।

সে কমলার লরি-জ্বালানোর কথা জানতো—সব ছাত্রই জানতো সে-কথা। আর জানতো কমলা ফেরার, তার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে ছাত্রসমাজে বিপ্লবের জোয়ার ডেকে আনবার জন্য। কমলা বিপ্লবী দলকে বুদ্ধি জোগায়, তাতায়, নিজে বড়ো একটা কিছু করে না। বিনা বাক্যে সে কমলাকে গ্রহণ ক'রে নিলে. একটিও কথা জিজ্ঞাসা করলে না. কেবল বললে, কাপড়ের কি হবে? ধুতিটা আমি দিতে পারি। একটু ভেবে নিয়ে, দাঁড়ান আমি আসছি ব'লে বাইরে গেলো। দরজায় কুলুপ দেবার শব্দ হলো। সামনে জলভরা সোরাই, কমলা আকণ্ঠ জলপান করলে সোরাইটাকে খালি ক'রে।

কুলুপ খুলে ঘরে ঢুকলো দয়ানন্দ্ একা নয়, আরো দুজন। দয়ানন্দ্ বললে, ধুতি পরা হলো না আপনার. পাজামা কুর্তা পরতে হবে। এখন ওপরে চলুন, এখানে থাকার দায় আছে।

ছাত্রাবাসের এ-পাশটা ছোটো. ঘর বেশি নয়; উপরে যাবার আলাদা সিঁড়ি। ভিড়-করা প্রধান অংশটা থেকে এটা আলাদা। কমলা ছেলেদের সঙ্গে উপরে গেলো। সিঁড়ির মাথায় উঠতেই রোগামতো একটি ছেলে বললে, ওই বাথরুম. চলে যান ওখানে।

কমলা প্রাণ ভরে স্নান করলে। সুৎনা গেঞ্জি কুর্তা পরার সময়ে হাসি রাখতে পারলে না, কিন্তু বুকে কোনো কাপড় না দিতে পেরে খুঁতখুঁত করতে লাগলো। ভাবলে, কি বদ সংস্কার। দূর হোকগে ছাই! বাইরে আসতে দেখলে রোগা ছেলেটি পাহারায় রয়েছে স্নানঘরের সামনে ইটের রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। ছোকরাটি তার চেয়ে বয়সে ছোটো, নিজেই নাম বললে, সতীশ। সে বললে, আপনার শাড়ি জামার খবরদারি করবোখন, আসুন আপনি।

ঘরের সামনে খাটে বিছানা পাতা, ঘরের ভিতরেও বিছানা। কমলা খাটেই বসলো। দল ক'রে ছেলেরা এলো, সকলেই এ-পাড়ার অধিবাসী। স্নেহভরে সকলেই নমস্কার করলে। দয়ানন্দ বললে, কমলাজী, আপনি আমাদের অতিথি, কোনো ভয় নেই আপনার। কমলা মাথা নিচু করলে। এতোগুলি ছেলের সামনে তার খেতে ... করতে লাগলো, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধা লজ্জাকে অতিক্রম ক'রে গেলো। খেতে খেতে সে সতীশের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পলায়ন ও সুড়ঙ্গবাস বর্ণনা করলে।

ঘরে একটা টেব্‌ল-ফ্যান ছিলো, আরো একটা এনে একজন সেটা তার বিছানার পাশে রাখলে। তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে নির্ভয় ক'রে তারা দরজা ভেজিয়ে চলে গেলো।

তারা যেতেই কমলা লঘুপায়ে খাট থেকে নেমে গৃহস্বামীর হাত-আরশিটা টেনে নিয়ে নিজের বুকের সামনে ধরলে, ব'লে উঠলো, মাগো! লজ্জায় তার মুখ সিঁদুর হয়ে গেলো। মনে

মনে বুককে বললে, কাল সকালে তোমাকে মজা দেখাবো। ঘরটা সতীশের, কমলার অঙ্গেও সতীশের জামা কাপড়। সকালে উঠেই সে আলনা থেকে সতীশের একটা তুপাট্টা সংগ্রহ করলে, তারপর কাশ্মীরি কিশোরী মেয়েরা যেমন ক'রে বুক সমতল ক'রে কাপড় বাঁধে তেমনি ক'রে নিজেকে বাঁধলে। আরশিকে বললে, লজ্জার দায় থেকে বাঁচলুম এবার। দরজা খুলতেই সতীশ জোড় হাত কপালে তুলে সম্ভাষণ জানালে, নমস্তে কম্‌লাজী। তার জাগার খবর পেয়ে অন্য ছেলেরাও এলো সম্বর্ধনা জানাতে। বারান্দা দিয়ে দেখা গেলো দূরে লরিটার পোড়া কালো কঙ্কাল আর রাস্তায় লাল পাগড়ির সমারোহ। পুলিশের আর ফৌজী-লরি ছুটোছুটি করছে সশস্ত্র সিপাই নিয়ে।

ছেলেদের মন্ত্রণাসভা বসলো সতীশের ঘরে। দয়ানন্দ্ বললে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন তা ব'লে আমি বসে থাকিনি কম্‌লাজী। এখনকার প্রশ্ন, আপনাকে নিয়ে কি করা যায়, আপনি কি করবেন ? আপনার বাড়ি ঘুরে এসেছি, সেখানে যাওয়া অসম্ভব। তল্লাশী হয়ে গেছে আপনার বাড়িতে, দরজায় সিপাই। আপনার মা'র সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি। শহরের কোতওয়ালী আর কর্নেলগঞ্জ থানায় আপনার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। আপনি ধরা পড়লে ক'বছর মেয়াদ হবে বলা শক্ত, কিন্তু হবেই। শহরের লোক আপনার নাম জপ করছে, কালেজের ছেলেরা বোধ করি আপনার নামে মন্দির বানাবে কিন্তু সে-

মন্দিরে সহায়তা থাক, আশ্বাস থাক, স্নেহ থাক, বাস করবার যো নেই। আর, এ-ছাত্রাবাসে মেয়ে আছে শুনলে পুলিশের রাগ করবার আগে হয়তো মালব্যজীর আত্মা রাগ করবেন, তাঁর তৈরি করা কিনা এটা! কমলা দয়ানন্দের কথার ধরনে হেসে ফেললে, বললে, তোমরা বলো কি করবো? বাড়ি ফেরা চলবে না জানি। জেল একবার খেটে নিয়েছি, আর সেখানে যেতে ইচ্ছা নেই।

সতীশ বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, জেল গিছলেন? কবে?

মৃদু হেসে কমলা উত্তর দিলে, সেটা নিরামিষ জেল, খুব ছোটোও ছিলুম তখন। আমার হম্‌নাম কম্‌লা নেহ্‌রুর সঙ্গে পিকেটিং করা তার কারণ।

দয়ানন্দ্ বললে, আমার কথার জবাব দিন আগে। বাঙালীরা গল্প পেলে আর কিছু চায় না। আজ হস্টেলে যে-কোনো সময়ে পুলিশের হানা হবে শুনছি, তার আগে আপনার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। যেতেই হবে আপনাকে, তবে নইনি যাওয়াটা সহজ, আর কোথাও যাওয়া ততোটা সহজ নয়।

কমলা জবাব দিলে, একটু রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়? এখন আমাকে কেউ চিনবে বলে মনে হচ্ছে না।

মাথায় তার কেশরাশি এলানো; দয়ানন্দ্ সেদিকে তাকিয়ে বললে, চিনবে না বটে! বাঙালী নই তার ওপর আবার অঙ্ক কষি, না হলে রবিন্দরনাথজী কি কালিদাস আউড়ে দিতুম। কমলা মুখ নিচু করে হেসে ফেললে।

একটি ছেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নেত্রে কমলার দিকে চেয়েছিলো, সে দয়ানন্দ্‌কে লক্ষ্য ক'রে বললে, অরে ও বলিয়াকে গধে, কম্‌লাজীকে পগড়ি পরিয়ে দে। আমার একটা যোধপুরী পগড়ি আছে, আনছি। সেই ছেলেটিই কমলাকে পগড়ি পরিয়ে দিলে। ১৯৪২ সালের অগস্ট মাস, লরি-জ্বালানোর, রেল-উলটানোর কাল, না হলে এই ছাত্রাবাসেই সেইক্ষণে আবার নূতন ক'রে মদনভস্ম হয়ে যেতো।

বারান্দা থেকে একজন ব'লে উঠলো, হাতার সামনের দিকে পুলিশ।

দয়ানন্দ্ চট ক'রে সতীশের একটা শেরওয়ানী টেনে নিয়ে কমলার গায়ে ফেলে দিয়ে বললে, পরে নিন জলদি। বেড়াতে যাওয়াই দেখছি উচিত। সতীশ যাবি?

ওরা তিনজনে লম্বা বারান্দাটা পার হয়ে বিপরীত দিকে গেলো। নিচের বাগানে তখন ওয়র্ডেন দারোগার সঙ্গে তর্ক করছে। দু'চারজন ছেলে চেয়ে দেখলে, দয়ানন্দ্‌কে কথার চিমটি কাটলে কিন্তু কমলাকে দেখেও যেনো দেখলে না। ওরা ও-কোণের সিঁড়ি নেমে নিরালা ফটকটার কাছে গেলো।

হঠাৎ সতীশ ব'লে উঠলো, কি সর্বনাশ্ কম্‌লাজী! আপনার কানে যে মেয়েলি গয়না! কমলার কানের হীরের ফুল দুটো চিকচিক করছিলো। সে সে-দুটো খুলে পকেটে রাখলে।

হাঁটতে হাঁটতে দয়ানন্দ্ বললে, এখন উপায় আমার কানের মাকড়ি

জুটো পরা, না হলে ও-কর্ণবেধকে লোকে সন্দেহ করবে। ভাগ্যে পাড়াগেঁয়ে ঠাকুরের ঘরে জন্মেছিলুম, সাহেব হয়ে যাইনি!

পাঁচিল টপকে কালেজের ক্রিকেট প্যাভিলিয়নে ঢুকে কমলা মাকড়ি পরলে, বললে, তোমাদের এখন বলি, অতো লোকের মাঝে কোনো যুক্তি করা সম্ভব নয়, তাই শহর ঘোরার কথা বলেছিলুম। আমি জোর ক'রে শান্ত হয়ে আছি, কিন্তু আমার মন নিরন্তর বলছে এখনি কিছু করা দরকার। তোমরা পরামর্শ দাও।

দয়ানন্দ বললে, তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু বালিয়ার রাস্তা বন্ধ। বালিয়া এখন বৃটিশ ভারতের বাইরে।

সতীশ কিছু বললে না।

কট্‌রা গিয়ে ওরা তিনজনে একটা এক্কায় উঠলো। দুটি সুবেশ শৌখিন আর একটি চাষাড়ে সওয়ারী। এক্কাওয়ালার পিঠে চোখ নেই, সে দেখলে না। জাঠ-সিপাই কিংবা বিট্‌-এর পুলিশ চিনলে না যে ওই রঙচঙে যোধপুরী পগড়ি-পরা লোকটি কমলা মিত্তির, দু'দিনের ধ্বংসলীলার নেত্রী, বিদ্রোহীকে মন্ত্র দেবার গুরু, তার নামে হুলিয়া আছে, গ্রেপ্তার করতে পারলে পাঁচশো টাকা পারিতোষিকও আছে।

কমলা বললে, লরিটাকে দেখে একবার শহরে চলো।

এতক্ষণ সতীশ চুপ করেছিলো। পোড়া-লরির মোড় অতিক্রম করতেই বলে উঠলো, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও। এক্কাওয়ালার পিঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখলে।

দয়ানন্দের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওরা প্রথমে হিউএট রোড গেলো, সেখানে কমলার বাড়ি। রাস্তায় লাঠি-সেপাইএর বেড়াজাল। টেলিগ্রাফের ছিন্ন তার যেখানে সেখানে, লোহার থামগুলো পথ পারাপার ক'রে দিয়ে মোচড়ানো। বাড়ি পর্যন্ত যাবার যো নেই। দূর থেকে দেখা গেলো সে-বাড়ির দরজায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, হয়তো এই আশায় যে স্ত্রীলোক বিদ্রোহী হলেও অসহায়া; ধর্মে সে গৃহাশ্রয়ী, তাকে ঘরে ফিরে আসতেই হবে।

স্টেশনে এসে সতীশ বললে, কম্‌লাজীকে আমি আমাদের বাড়ি নিয়ে চললুম দয়ানন্দ্‌। জানিনে আশ্রয় দিতে পারবো কিনা, একবার কপাল ঠুকে আমার বাবাকে পরখ ক'রে নিই। সব কথা এখনো ভালো ক'রে ভাবতে পারিনি।

চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে হাত তুলে দয়ানন্দ্‌ বললে, নমস্তে দেবীজী, আপনাকে ভুলছিনে। কালেজে ফিরে আসেন, আবার সতীনের গান শোনাবো। না আসেন—

এঞ্জিনের তীব্র বংশীধ্বনিতে তার বাকি কথাটা ঢাকা পড়ে গেলো।

কমলা মিত্তির বিজ্ঞানের ছাত্রী। অনার্স নিয়ে বি-এসসিতে সে আগের বছর প্রথম হয়েছিলো। কিন্তু সেটা তার মামুলি বাহ্যিক পরিচয়। পড়ার জন্য পড়া নয়, বিজ্ঞানের বাণী সত্যই তার অন্তরে প্রবেশ করেছিলো। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে তার জ্ঞান বিস্তৃত।

নববিজ্ঞান বলে, অতিরিক্ত খেলায় নারীদেহ গভীর বিপর্যয়ে পুরুষের মতো হয়ে যায়। সে-বিপর্যয়টা যে কী গভীর ও ব্যাপক তা আমাদের উপলব্ধিতে নেই। তাতে এক প্রাথমিক যৌনবিভেদ ছাড়া পরিবর্তিত নারীদেহের পুরুষদেহ থেকে বিশেষ কোনো বিভেদ ধরা পড়ে না। বিজ্ঞানীরা তবুও এ বিস্ময়কর ব্যাপারটা জানে। যা বোধ করি তাদেরও চোখে ধরা পড়েনি তা মেয়েদের মনের, জীবনের প্রতি দৃষ্টির পরিবর্তন। বিজ্ঞানের কৃপায় নিত্যই নানা বস্তুর রহস্য দ্রুতগতিতে লুপ্ত হয়ে চলেছে। ছোটবেলায় তার যা ছিলো কেবল বিস্ময়ের আর বিশ্বাসের বস্তু তা জ্ঞানের আলোয় অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, রহস্য গেলো দূরে। কমলা সাধারণ

মানুষের চেয়ে বিশ্বনিয়মের নিকটবর্তী, কার্যকারণ, প্রাকৃতিক বিধান তার রিয়ালিটি জ্ঞানের সীমানার অন্তর্গত। সে যখন তার জৈব অদৃষ্ট মানে তার মনে পড়ে যায় যে সে রমণী। যখন সে-বিষয়ে তার চেতনা থাকেনা, তখনকার সত্তা তার পুরুষের। তার মনের সামান্য একটি কোণে নারীত্ব, বাকি বিস্তৃত ক্ষেত্রটায় সে পুরুষ। নারীদেহে পুরুষের মন, হয়তো এ কালের বিড়ম্বনা; কিন্তু সেটা কমলার বিষয়ে প্রখর সত্য। জীবনস্রোতের একটা পাড় পুরুষ আর অন্যটা যদি রমণী হয়, কমলা পুরুষ-পাড়টার অধিবাসী, শুধু স্রোত পার ক'রে একটা সূত্র তার সঙ্গে অন্য পাড়টার সংযোগ রেখেছে।

সেদিন পর্যন্ত সংস্কারের দ্বন্দ্ব ছিলো তার মনে। বায়োলজি অমর, তার উপর আবার অভ্যাসের সংস্কারের পোঁছ দেওয়া। কাজেই বায়োলজিকে অগ্রাহ্য করবার যো নেই। মানুষ রমণী বা পুরুষ যাই হোক না কেন সব মূখ্য সংস্কার যে তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী-রূপে প্রতিফলিত হবে, এ-কথা সত্য নয়। আহার ও সংগ্রাম অমোঘ সংস্কার, সে-দুটি সব জীবেরই অদৃষ্টলিপিতে বাঁধা। কিন্তু কমলা খুব কম বয়সেই এ-কথাটা উপলব্ধি করেছিলো যে আর দুটো সংস্কার—যৌনতা আর মাতৃত্ব, খুব ব্যাপক নয়। এ দুটোর শিকড় আছে সকলেরই মনে কিন্তু সে-শিকড় কোথাও রস আহরণ ক'রে সংস্কার দুটোকে পুষ্ট করে, কোথাও করে না। মাতৃত্ব যেমন রমণীর তেমনি পুরুষেরও সংস্কার, ওরই ভেতর মানুষের দ্বৈতরূপ।

পুরুষ কেবল পুরুষ নয়, রমণী কেবল রমণী নয়, দুটোয় মেশানো, দুটোর সমন্বয়ে পূর্ণ মানুষ। প্রকৃতির দান এইখানে শেষ, তারপর যে যেমন ক'রে নিজেকে গড়ে নেয়। একটা অজ্ঞাত শক্তি কমলাকে অন্য রকম ক'রে গড়েছিলো।

কমলার রূপ প্রতারকের। দেহের রূপ তার ভুবনমোহিনী, ডিম্বাকৃতি মুখ, দীর্ঘ সুকুমার দেহ, যা ভাস্করের হতাশা কিন্তু ভাস্করের বাটালি আপনার প্রেরণায় ওই লেপ্টোসমেরই সন্ধান ক'রে বেড়ায়। আলো-আবেষ্টনের তারতম্যে কমলার দেহ কখনো দেবীর, কখনো মাতার, কখনো শাশ্বত দয়িতার, কখনো বা মোহিনী মায়ার। কিন্তু তার অন্তর্বাসী আর কেউ; সে বুদ্ধিদীপ্ত, সে পুরুষ, সে বিজ্ঞানধর্মী, সে বাঁধা পৌরুষ কর্মপ্রবাহে। কমলা যে-হাতে রান্না করে সেই হাতেই সূর্যমণ্ডলের অন্তরতম বাণীর অর্থান্বেষণও করে। রূপ তার অপরকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তার চোখের বিশিষ্ট দ্যুতি বিকর্ষণও করে তেমনি। সে মেয়ে আবার মেয়ে নয়ও; বোধ করি সে বিশ্বস্রষ্টার অকল্পিত অলব্ধ এভল্যুশনের অভাবনীয় নূতন জীব। তার প্রকৃতি পরিবার গড়ার নয়, সৃষ্টিকর্তার তৈরি বিশ্বের মায়াপুরীর নূতন নূতন কক্ষের রহস্য উদ্‌ঘাটনের। তার স্বভাবে সেই ইঙ্গিত, তার মনে সেই উদ্‌গতিগত সংস্কার। রান্নার সময়ে তার হাতের চুড়ি বাজার মানে এক, কিন্তু শব্দোর্মি নির্ণয়ে স্পর্শকাতর ভঙ্গুর যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার কালে তার চুড়ির শিঞ্জনের অর্থটা অন্য—জ্ঞান

রহস্যের দেউলে যেন ঘণ্টা বাজিয়ে সুপ্ত কোনো দেবতাকে ডাকা। যখন সে তার দেহকে অলঙ্কৃত করতো তখন কমলা মেয়ে হয়ে যেতো। সূর্য যেমন চির-আর্টিস্ট, অক্লান্ত রূপ কল্পনায় অস্তগগন-পটে নিত্য নব ছবি আঁকে, নিজের দেহের কারণে কমলাও তেমনি অক্লান্ত চির-আর্টিস্ট। দেহে তার রূপ ধরে না। বোধ করি এ-বাক্যটার চেয়ে রূপ বর্ণনা করবার শ্রেষ্ঠতর ভাষা আর নেই। তার রূপ পুরুষের পুরুষালিকে নত বিনম্র ক'রে দিয়ে তাকে পৌত্তলিক ক'রে দেবার। খেয়াল হলে দাঁড়া আরশির সামনে কমলা নিজেকে সম্পূর্ণ বিবসন ক'রে দেখতো। রক্তিম পাদনখর থেকে কুন্তল পর্যন্ত, দেহের প্রতিটি টোল খাঁজ তার মুগ্ধ-করা। প্রকৃতি হাজার হাজার বছরে তিল তিল ক'রে তার বস্তিপ্রদেশ গড়েছিলো, নীরস বিজ্ঞানী যাকে সভ্যতার বিবর্তনলব্ধ ব'লে মানে শুধু। সুদূর ভবিষ্যতের কমলাকে লক্ষ্য করেই বোধ করি কালিদাসপ্রমুখ কবি করভোরুর স্তুতি গান করেছিলো, যা আজ কেবল অমর-কোষের একটা নীরস শব্দ। রসিক কারুশিল্পী সেই অপূর্ব অঙ্গ দুটিকে মনে রেখেই মেখলা নির্মাণ করেছিলো।

কমলা হার পরতো, মেখলা পরতো উলঙ্গ বেলায়। বস্ত্র সজ্জিত হয়ে ও-দুটি অলঙ্কার কখনো পরতো না, সে-পরার মানে নেই বরং তাতে ও-অলঙ্কারের লজ্জা আছে। রঙের তুলি দিয়ে আগেকার ফরাসী রূপসীদের মতো যখন সে তিল এঁকে দিতো দেহের কোনো বৃত্তশীর্ষে কিংবা ঢালু সীমানায়, আকাশ-নীল বা কালো তিল, সে

তিলোত্তমা হয়ে যেতো। লাল তিল আঁকতো না তা বার্ধক্যের পরিচায়ক ব'লে। এই তার আর্ট। কমলা ছবি-আঁকা শিখেছিলো আপন আবেগে, খেলার ছলে, যে-আঁকাটা প্রকৃত আঁকা। এই তিল-আঁকা চুকে যেতো তখনই। উপভোগ ছিলো তার একার। যে-দৃষ্টি শুধু রূপ দেখে, রূপের আধারকে দেখে, রক্ত মাংস মেদের তালটাকে দেখে না, হীরার দ্যুতিটুকুকে দেখে, পাথরটাকে উপলব্ধি করে না, সেই দৃষ্টি কমলার। প্রকৃত আর্টিস্টের মতো কমলার এই দেহ দেখার নেশা উত্তেজনার অতীত। উত্তেজনার সীমানা ছাড়িয়ে সৎ ও সত্যের ধাপে উঠে যেতো তার সব প্রতিক্রিয়ার উপলব্ধি, যার কারণে শিল্পী জাত-মানুষ থেকে আলাদা, মানুষের সম্পর্কের চেয়েও নৈসর্গিক সম্পর্কটা যার বড়ো।

প্রত্যেক মেয়েরই মনে রাজকন্যা লুকিয়ে থাকে, রাজার দুলাল তাকে অহরহ ডাকে। সে-ডাক, রাজার দুলালের জন্য সে-অপেক্ষাটি সুমধুর। সেটা সবই কল্পনার ছবি ব'লে তার ইঙ্গিত শিহরণ রোমাঞ্চ অনির্বচনীয় মোহ আনে। কমলা যখন স্কুলের দশম শ্রেণীতে তখন নিজেকে রাজকন্যা বলে ভাবতো, রাজার দুলালের কল্পনা করতে তার গায়ে কাঁটা দিতো। চোখ বুজোলে রাজার দুলালের কোনো স্পষ্ট মুখ দেখা যেতোনা, কিন্তু দেখতো তার গজমোতির মালা। সে প্রাসাদ অলিন্দের কল্পনা করতো, মনে মনেই দূর-দিগন্তে অপসৃত কল্পিত রথের চূড়ার দিকে চেয়ে নিজেকে বলতো,

"ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে।"

নিমেষের দেখা সত্য হয়ে উঠতো। মণিহার ফেলে দেবার আকুতি উন্মাদনায় ভরে যেতো তার মন। চিত্তদোলায় সুখবেদনার ঢেউএর পর আসতো অন্য বেদনার ঢেউ। কল্পিত হতাশায় সে বিহ্বল আকুল হয়ে ভাবতো,

"মোর হার ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে—"

সব মেয়েরাই এই রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবার বেদনাটাকে বোঝে, এ-অবহেলার বেদনায় তার হৃদয় মথিত হয়ে উঠতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের এ-রাজকন্যা খর্ব হয়ে গেলো. রাজপুত্রের রোমান্স গেলো চুকে। বায়োলজি মানুষের রোমান্স সম্ভ্রম হানিকর। সে-বিজ্ঞান তার মনে ধাক্কা দিয়ে জড় সত্যের দিকে নিয়ে গেলো। সে-সত্য রসের আবরণ বিবর্জিত। শুধু তার মনে একটু ক্ষীণ রোমান্স জেগে রইলো, যদি দয়িত হয়ে তার জীবনে কেউ আসে, তার প্রথম কাছে আসা, যার মাধুর্যের

বিস্ময়ের তুলনা নেই; যার তুরুতুরু ভয়; যার বাইরে মানুষের আর কোনো আত্যন্তিক প্রকাশ, আত্মা-ছাওয়া আবেগ নেই; যার বাইরে মানুষ অন্য নানা জীবের মতো একটি জীব মাত্র।

স্বপনদেশের যুগযুগান্তরের রাজকন্যা চিরসুপ্ত। সে জাগে সোনার কাঠির ছোঁওয়ায়। জাগে রাজার দুলালের স্পর্শে শুধু, সেই তার সোনার কাঠি। বাইরে যুগান্তকারী বিপ্লবকারী ঘটনা আর কই! কিন্তু মনের রাজ্যে বিস্ফোরণ নিত্য। কতো যুগ আসে যায় মনে, কতো পরিবর্তন মানবপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একদিন কমলা একটা পত্রিকার পাতা উলটাচ্ছিলো, তার চোখে পড়ে গেলো:

"রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়।
স্বপ্ন দেখে রাজার কুমারী,
রাজপুত্র বসে আছে শিয়রের পাশে
—শয্যায় তাহারি
নয়ন ভরিয়া দেছে অজস্র চুমায়।
রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়।
কতোদিন কতোরাত্রি কতো কতো যুগ হলো শেষ,
কতো রাজ্য ভেসে গেলো ধ্বংস হলো কতো শত দেশ।
যবে চোখে ঘুম এলো সেদিন যাহারা ছিলো তাহারা কোথায়?
সে-যুগের স্বপ্ন দেখে তবুও রাজার মেয়ে আজিও ঘুমায়।
রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়।

রাজকন্যা আজ যদি জাগে ?

সোনার কাঠিতে নয়—

রাজপুত্র আসিবার আগে

প্রাসাদের বাহিরের

নিপীড়িত মানবের আর্তনাদ

আজ যদি তাহারে জাগায় ?

প্রাসাদ. রাজার ছেলে ফেলে যদি ছুটে আসে মানুষের মাঝে ?

যে-মানুষে দলিয়াছে রাজপুত্র—আধুনিক রাজার কুমার !

নয়ন ফিরাবে নাকি দুঃসহ ঘৃণায় ?

তবু হায়—

রাজপুত্র আজো জানে,

শুধু রাজকন্যা নয়,

আরো আরো বহু বহু মেয়ে

সোনার কাঠির স্পর্শে অঘোরে ঘুমায় ।"

কমলা বারবার কবিতাটা পড়লে, ভাবলে, এই তো তার মনের কথা। মানুষের আর্তনাদ তখনো সে শুনতে শেখেনি, কিন্তু তার চিন্তা ও ক্রিয়ার রাজ্যে জীববিদ্যার সত্য, শব্দ আলো বায়ুর নূতন বিভ্রম-করা সত্যের তরঙ্গ। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে সকল রাজকন্যার অবসান, সে-আঘাত বোঝবার বহু আগে তার মনের ঘুমন্ত স্বপ্নবিলাসিনী রাজকন্যার মৃত্যু ঘটলো সেদিন ; মনের এক

কোণে তার রমণীত্বটুকু অবহেলায় পড়ে রইলো। সে রমণীত্বের অঙ্গে নানা চিন্তার কেলাসনের আবরণ পড়তে লাগলো ক্রমাগত।

সে প্রকৃতিগুণে বিদ্রোহী। কালের আকাশে বিদ্রোহ, বোধ হয় এ-যুগে বাস ক'রে কারো বিদ্রোহের প্রভাব এড়াবার যো নেই। মুক্তিলোভীরা মুক্তি খুঁজতে আরম্ভ করেছে, ঘর থেকেই সে অনুসন্ধানের আরম্ভ।

তার বাপ ছিলেন প্রখ্যাত উকিল, তিনি মারা গেছেন অনেক দিন। সংসারে অন্নচিন্তা নেই। মা সুজাতা কবিধর্মী, মন তাঁর সংসারের বাইরে ছড়ানো। দেশোপলব্ধি তাঁকে স্বপ্ন দেখায়, তাঁর সকল বিষয়ে আন্তরিকতা কমলার মন ছোঁয়। ছোটবেলা থেকেই সে জানতে শিখেছিলো, নিজের চেয়ে, নিজের সমাজের অনেক তুচ্ছ বস্তুর চেয়েও বড়ো কিছু আছে, আত্মোৎসর্গ করা উচিৎ সেই বড়ো আইডিয়ার কাছে। সুজাতা বাস্তবের চেয়ে আইডিয়াকেই মূল্য দিতেন বেশি ক'রে। সেজন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁকে কবি ব'লে গালাগালি দিতো।

ছোটো ভাই বিলু। কমলার ভাই, তারও রূপ ধরেনা। বিলু মেয়ে হ'লে অনেক রূপসীর রূপকে ম্লান ক'রে দিতো। কমলা যখন স্কুলে পড়তো, বিলু বাড়ির কাছাকাছি ছোটো একটা মেয়ে-স্কুলে যেতো। একদা সে বেচারা সেলাই আর রান্নার পরীক্ষায় ফেল করে, অর্থাৎ কাপড়ে দাঁড়া সেলাইএর ফোঁড় না তুলতে পেরে ও

আলু ভাজতে বিফল হয়ে বিদ্রোহী হয়ে গেলো। বাড়ি ঢুকলো ইন্‌কলাব জিন্দাবাদ প্রচার করতে করতে। শিশুমুখে ইন্‌কলাব এলো ওদের ঘরে সেদিন। ফেল-করা ছেলের মুখে বোধ করি ইন্‌কলাব ধ্বনিটা বেশি জোর পায়, বিলুর ইন্‌কলাব জোরালো। সুজাতা বিলুর দুঃখে হাসলেন, বললেন, আহা, ওর চরম লজ্জা হয়েছে। কমলা তার সেলাইএর অক্ষমতার জন্য রাগ করলে কিন্তু ইন্‌কলাব ভুলতে পারলে না।

মনে পড়ে মর্নিং স্কুলের দিন তখন। কমলাদের স্কুল-গাড়িটা প্রখর ঝলসানো দুপুর রোদে চৌক ঘুরে আসছিলো। সে দেখলে এক মদের দোকানে পিকেটিং হচ্ছে। কম্‌লা নেহ্‌রু বসে ফুটপাথের ধারে—কি করুণ, কি ভঙ্গুর, কি ম্লান সে-মূর্তি! ভীড়ের কারণে স্কুল-গাড়িটা সেখানে থেমেছিলো। কমলা আর গাড়িতে ব'সে থাকতে পারলে না; অন্য কমলার কাছে নেমে গেলো। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একটি প্রৌঢ়া বাঙালী বিধবা, মাথায় ভিজে গামছা, মোটাসোটা, প্রসন্নমুখ। তিনি কমলাকে দেখেই বললেন, তুই কার আগুনের খাপরা মেয়ে মা? আয়, পিকেটিং করবি? তোকে দিয়ে বেশি কাজ হবে। সত্যিই। কম্‌লা নেহ রুকে সম্ভ্রম করলেও রসপিপাসীদের মন মানছিলো না, কিন্তু কুমারী কমলা মিত্তিরের অনুনয় অনুরোধ অব্যর্থ শক্তি হয়ে দাঁড়ালো।

সন্ধ্যায় কমলা ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলো, বেদের কালেও

সোমরস ছিলো, সে-রসের রসিক ছিলো। আজও আছে, পরেও থাকবে। তবে পিকেটিং করতে গেলুম কেন? তার নিজের মনই সে কথার জবাব দিলে, অন্যায়ের, মানুষের অপচয়ের প্রতীক ওটা, তাই তার বিরুদ্ধে এ-আপত্তি। বাড়ি এসে সে সুজাতাকে বললে, মা, কমলাজীকে দেখে থাকতে পারিনি, পিকেটিং ক'রে এলুম। মা বললেন, জানি। বিলুর জন্য আমার যাবার যো নেই। কিন্তু সে-বাঁদরও বানর সেনার সঙ্গে কোথায় গিয়েছে।

রাত্রে তিনি শুয়ে শুয়ে হাত জোড় ক'রে নতি জানিয়ে বললেন, কালের ঠাকুর! এদের ছেড়ে দিলুম তোমার হাতে। হয়তো এ সবের মানে নেই, আজ যা মূল্যের কাল হয়তো সেটাই হবে মূল্যহীন। কাল ভাবতে বসলে হয়তো হাসি পাবে আজকের কথায়। তবুও দরকার আছে বৃথা চেঁচামেচি, আন্দোলন, আস্ফালন। এর পেছনে যে পবিত্র সেবার, আত্মবিলোপ করার মন আছে তা যেন চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে দেবতা!

পরদিনটা রবিবার। কমলার পরীক্ষা হয়ে গেছে, আর কোনো ভাবনা নেই। ভোরবেলা চাকর ত্রস্ত হয়ে এসে খবর দিলে, দিদি, দরজায় কমলাজী দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আরো অনেকে। গাছ-কোমর বাঁধতে বাঁধতে কমলা তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। নামতে নামতে চিৎকার ক'রে বললে, মা, চললুম। সুজাতা পূজা করতেন, শুধু ধ্যানের পূজা। ধ্যানস্থ হয়ে তিনি মনে মনে আবৃত্তি করছিলেন :

"তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি।"

মেয়ের ডাক তাঁর কানে গেলো, বুঝি বা প্রভাতের ভাস্বর আলো জেগে উঠলো তাঁর চোখে। কন্যার কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বাজতে লাগলো, যেন 'মা চললুম' বললেনা আর, বলতে লাগলো :

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।"

সাতসকালে কেউ মদ কিনতে আসেনা, রেল স্টেশনের মতো মদের দোকানে ভীড়ও জমে থাকেনা। যারা অভ্যাসগত মদ্যপায়ী তারা কম্‌লা নেহ্‌রু ও অন্য মহিলাদের মুখ চেয়ে সরে যায়, বোধ হয় মেয়েদের বিরুদ্ধতা করতে তাদেরও মনে মায়া লাগে। বেলা বাড়ে, হঠাৎ ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ে। প্ররোচিত ক্রেতা, তাদের মদ খাওয়ার চেয়েও কেনাটা, বিরোধ বাঁধানোটাই বড়ো কথা। কমলা ও আরো মেয়েরা, বিশেষ ক'রে সেই প্রৌঢ়াটি দোকানের দরজা জুড়ে শুয়ে থাকে। তাদের ডিঙিয়ে মাড়িয়ে যেতে তৎপর এমন মানুষও এ-দেশে বহু, যারা তাদের চায় অনায়াসে খুঁজেও পায়।

দুপুরে এলো পুলিশ-লরি। কাছেই কোতয়ালী, পদাতিক পুলিশও এলো দল বেঁধে। কম্‌লা নেহ্‌রু লরিতে উঠলেন দম্ভিত অনুরোধে। অন্য অনেকগুলি মেয়েকে পুলিশ সেপাই হাত ধরে টেনে এনে গাড়িতে পুরলে। প্রৌঢ়াটি ধরা পড়বার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তাকে কেউ

ধরেনা। তিনি সেপাইদের অনুরোধ করছিলেন, এ বাবা সিপাহি, মুঝে পকড়ো। সব সেপাই কিন্তু বলে, বুঢ়িয়া মাজি, আপ ঘর যাইয়ে। বুড়ির ভারি খেদ, কেউ ধরেনা। তিনি মুখে বলেন, মা মা, আমাকে কেউ ধরছেনা যে! কমলা চললো, আমি যাবোনা? ও কমলা, বল্ মা বল, আমাকে ধরতে বল্। আমার জেলে যাবার ভারি সাধ! কমলা নেহরু গাড়িতে ব'সে মৃদু হাসেন। বুড়ি দারোগার কাছে গিয়ে বলেন, এ বেটা দারোগাজি, মুঝে ভী পকড় লো। এই দেখো আমার কাপড়ে মদের গন্ধ। ওরা পথে শুয়েছিলো, আমি দু' দুটো বোতল কেড়ে নিয়ে ভেঙেছি। দারোগাও তাঁকে বাড়ি যেতে বললে। তিনি হতাশ হয়ে গামছাশুদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, মা মা, কচি কচি মেয়েগুলোকে ধ'রে নিয়ে চললো, কোনো মুখপোড়া আমাকে বুড়ি ব'লে ধরতে চায়না যে!

একটা সেপাই কমলার হাত ধ'রে টানতে গিয়েই ছেড়ে দিলে, মুখে বললে, গাড়িতে ওঠো। সে-প্রতিমা ছুঁতে তার সঙ্কোচ বোধ হলো। তার কর্কশ কলুষ হাতে কমলাকে স্পর্শ করা যায় না। কমলা নিজেই গাড়িতে উঠলো।

জন্মগত কৌলিক আভিজাত্য আজ শুধু বিপন্ন নয়, হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রহ্মণ্য ভারতে যজ্ঞোপবীত পরেছে শুধু পুরুষ, তাও আজ হাস্যকর। যজ্ঞোপবীত আজ সুতোর গোছা মাত্র। কিন্তু পৃথিবীতে আভিজাত্য ও ব্রাহ্মণত্ব অতি পুরাতন, ও-দুটোর মৃত্যু

অসম্ভব, তাদের রূপ পরিবর্তনশীল। আভিজাত্য ব্রাহ্মণত্ব দুটোই সহজ, দুটোই আগের চেয়েও ব্যাপক। এখন জেল-বাসের দ্বারা নব-অভিজাত নব-ব্রাহ্মণের নূতন জন্ম। এ নূতন যজ্ঞোপবীত এখন রমণীর পক্ষেও সুলভ। সমাজও এখন জন্মের আভিজাত্য ও ইন্টেলেক্টের ব্রাহ্মণত্বের বদলে নূতন আভিজাত্য ও ব্রাহ্মণত্বকে মেনে নিয়েছে। নেপোলিয়োঁ দেহে তরবারির পুরনো ক্ষত দেখে নিজের সৈন্যদলে লোক ভরতি করতেন, তেমনি জেল-বাসের পরিচয় আজ যোদ্ধৃমনের পরিচয়।

মালাকা জেল ভরতি, কমলাদের নইনি জেলে নিয়ে গেলো। হাতে হাতে বিচার, কম্‌লা নেহ্‌রুর দণ্ডাজ্ঞা হলো দীর্ঘ আর কমলা মিত্তিরের হলো এক মাস।

বিরাট একটা মাঠের মতো ঘরে কমলাদের ডেরা পড়লো। সাধারণ কয়েদীদের নানা আকার। খাটো পাজামা আর নামমাত্র জামায় এই প্রায়-অনাবৃতদেহ ওদের লম্বরদারনীদের দেখে কমলার মনে হলো নোংরা ঘরটায় নানা পোকামাকড়ের মতো এরাও এক রকমের কীট। কমলারা একটা ক'রে দড়ির খাটিয়া ও নিজেদের জামা-কাপড় পরবার অধিকার পেলে। একটা লম্বরদারনী কম্‌লা নেহ্‌রুর খাট একটা জানলার কাছে পেতে দিলে; ভিড়ের ভিতরেও সম্ভ্রমের বেষ্টনি তাকে আলাদা ক'রে রাখলো।

কমলা অরবিন্দের 'কারাকাহিনী' আর বারীন ঘোষের 'দ্বীপান্তরের বাঁশি' পড়েছিলো। বারীন ঘোষের বই থেকে সে কারাবাসের

দুঃখটার আন্দাজ ক'রে রেখেছিলো। তার আগে যারা পিকেটিং-এর দায়ে জেলে এসেছিলো সে-সব মেয়েদের সঙ্গে কমলার ভাব হয়ে গেলো। তারা খবর দিলে, এক গরম ও স্নান করবার অসুবিধা ছাড়া আর কোনো কষ্ট তাদের নেই। ভোজ দুবেলা। এমন ভোজ উৎসব ছাড়া কারো বাড়িতে হয় না। কে একজন ধনী পুরুষ রাজবন্দী প্রতিমাসে দুটি হাজার টাকা ছড়ায়। তার কারণে পুরুষ-পাড়ায় যেমন মেয়ে-পাড়াতেও তেমনি নিত্য ভোজ। কমলা প্রথম দিনেই তার প্রমাণ পেলে।

তার খাটিয়ার কাছেই একটি লম্বরঁদারনী রাত্রে শুতো। স্ত্রী-লোকটার যৌবনের প্রান্তসীমা ; দেখতে সুশ্রী, কিন্তু মুখে একটা অবর্ণনীয় কাঠিন্যের ছাপ, তার দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল ও অনুসন্ধানী। দিনের বেলাতে যখন তখন কমলার সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়ে যেতো ; তার যেন পলকশূন্য দৃষ্টি দিয়ে কমলাকে দেখা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলোনা। সে কি দেখতো তা কমলা বুঝতে পারতো না কিন্তু তার দৃষ্টিতে সে অস্বস্তি বোধ করতো আর নিজের চোখ নামিয়ে নিতো। স্ত্রীলোকটা কমলার অল্পস্বল্প সেবা করে তার সঙ্গে ভাব ক'রে নিলে। অন্য ক্ষেত্রে হলে এ-আলাপের সুযোগ হতো না, কিন্তু বদ্ধ সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনে স্ত্রীলোকটাকে এড়াবার উপায় রইলো না।

এক গুমোট রাত্রে কমলার খাটিয়ার কাছে ব'সে স্ত্রীলোকটা নিজের পরিচয় দিলে। তার নাম বিলাসিয়া। এইবার নিয়ে

পাঁচবার তার জেল হয়েছে। অপরাধ সামান্যই, যুবতী সুন্দরী মেয়ে ভোলানো, তাদের ইহকালের গতি ক'রে দেওয়া। কিন্তু কেউই তার এ-দয়াধর্মের সমাজসেবার মর্ম বোঝেনা, তাই তার বন্দীদশাতেই দিবস কাটে। বিলাসিয়া সেই থেকে প্রত্যেক রাত্রিতে তার শিকারের আর তার অভিজ্ঞতাসঙ্গত মানবপশু চরিত্রের গল্প বলতে লাগলো। তার লজ্জাবোধ তো ছিলোই না, তার কাজকে অপরাধ মনে করা দূরে থাক, কাহিনীগুলোয় বিচিত্র এক জয়ের উল্লাস ছিলো। নিত্য সে কমলার চোখের সামনে উদগ্র উলঙ্গ লালসার উৎকট ছবি আঁকতে লাগলো। প্রথম প্রথম কমলার নিদারুণ লজ্জা হতো, ঘৃণা হতো, কিন্তু আবেষ্টন ও অপরিহার্য সঙ্গ গুণে ক্রমশঃ সে-ভাব গিয়ে গল্প শোনার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ এলো তার মনে। উলঙ্গ কাহিনী শুনে শুনে বিলাসিয়ার ভাষারও সে মর্মবোধ করতে শিখলে, যা ইহজীবনে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে শিখতে পারে না। শুধু কমলা নয়, অন্যত্র বোধ করি অন্য কিশোরী ও যুবতী বন্দিনীদেরও সংস্কারের কাজ চলছিলো। কমলার পিকেটিং-এর সঙ্গিনী লছমী ও ললিতা বদলে গেলো। তাদের চোখের ও মুখের যা ভাষা তাতে কেবল স্বৈরিনীর লালসার ইঙ্গিত। তাদের মনের আবহাওয়াটাই ভিন্ন হয়ে গেলো।

একদিন তার শিয়রের কাছে ইটের লেখা দু'লাইনের হিন্দি একটা কবিতা পড়ে কমলা চমকে উঠলো। স্তব্ধ হলো এক

রাত্রিতে ললিতাকে নূতন একটা কবিতা লিখতে দেখে। তার শিয়রে এ-লেখা কেন? সেটা যে তার মন তৈরি করার প্রয়াস সে-কথাটা অবশেষে একদিন স্পষ্ট হলো। বিলাসিয়া একদিন তার হাতে একটা ছোটো চিঠি দিলে। জেলের পুরুষ-পাড়ার চিঠি। তাতে নাম ছিলো না কোনো কিন্তু বিলাসিয়া তার কানে যে-নাম উচ্চারণ করলে তা শুনে সে বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সে-নামটা প্রচণ্ড ধনী এক তথা-কথিত দেশনায়কের। চিঠিও আসতে লাগল ঘনঘন, প্রত্যেকটির নূতন নূতন সুর, তাতে রঙিন ক'রে আঁকা কমলার ভবিষ্যতের দিনগুলি।

কমলা পিকেটিং করতে গিয়েছিলো ভেবেচিন্তে নয়, দেশপূজার প্রেরণায়ও নয়; কম্‌লা নেহ্‌রুর করুণ ক্লান্ত মুখ দেখার বেদনার আকস্মিক উত্তেজনায়। তবুও তার মনে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীর আবহের উপলব্ধি ছিলো। সুজাতা তাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে শোনাতেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কোনো মন্ত্র জানতেন না, রবীন্দ্রনাথের গান মন্ত্র ব'লে আবৃত্তি করতেন। কমলা বুঝতো তা গান নয়, প্রার্থনা পূজার অঙ্গ, ধর্মসাধনার নূতন উপকরণ। এমনি ক'রে তার মনটি প্রস্তুত হয়েছিলো। দেশের জন্য বিদ্রোহ করাকে সে ধর্মের অঙ্গ ব'লে মনে করতো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠতো শান্তি, দেবী চৌধুরাণীর পূজারিণী ছবি।

ছেলেবেলায় সে এক অ্যামেরিকন্ বালিকা বিদ্যালয়ে বাইবেলের গল্প শুনেছিলো। বিলাসিয়াকে দেখলেই তার মনে হতো, এই তো

সেই কালসাপ! তার দেহে দৃষ্টিতে অদ্ভুত আকর্ষণ, নিশ্বাস অবশ-করা, দংশনে বিষ-জরজর মৃত্যু। কিন্তু মানুষের মন আশ্চর্য। প্রথম চিঠিতে কমলার ঘৃণা বোধ হয়েছিলো, ভয় হয়েছিলো। তারপর তাতে এলো যেন একটা অভিনব বিচিত্র খেলার আকর্ষণ। বিলাসিয়া তার মনটিকে গড়ে পিটে নিয়েছিলো।

একদিন এই স্ত্রীলোকটা কমলাকে বললে, বহন্, টাকায় কি না হয়! এ-জেলে টাকার দরদ নেই, তার কোনো দাম নেই, কাজেই ধনীর ইচ্ছার প্রতিরোধ নেই। চিঠি কেবল তোমার কাছে আসেনি, এসেছে আরো অনেকের কাছে। অধিকাংশ তারা 'না' বলেনি, তোমার মতো অপেক্ষাও করায়নি আর কেউ। শুনবে টাকায় কি হয়? আগের বারের অসহযোগের সময়েও আমি এইখানে এই ঘরেই ছিলুম। যিনি তোমাকে চিঠি লেখেন তিনিও ছিলেন এখানে। একবার তাঁর স্ত্রী দেখা করতে আসবে, ধুমধাম লেগে গেলো। ওই দিকের বাগানের কোণে তাঁবু পড়লো। স্ত্রীটি সেখানে তিনটি রাত্রি কাটালো। কালে তার গর্ভের কথা নিয়ে কানাকানি হতে লাগলো। কর্তাটিই সে-সমস্যার নিরসন করলেন সে-তিন রাত্রির কাহিনী প্রচার ক'রে।

বিলাসিয়া নিরলস হয়ে কমলার পিছনে পড়লো। সে অল্পপরিসর স্থানে ইচ্ছে করলেও তাকে এড়াবার যো নেই। দিনরাত তার ফিসফিস কথা, নানা ইঙ্গিত। অন্য লম্বরদারনীগুলো কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে কমলার দিকে চেয়ে থাকতো; বোধ করি ভাবতো

এ রূপসী বাঙালী মেয়েটার দিন আগত। লছমী ও ললিতাকে ঘেরা কি রকম একটা জঘন্য কদর্য আবহ। বিলাসিয়া তাদের তুইতোকারি করতো। তারা কাছে এলে কমলার গা ঘিনঘিন ক'রে উঠতো। সে-অনুভূতির্ তার জানা কোনো কারণ ছিলো না ; কিন্তু তবুও সেটা আপনি আসতো তার মনে।

এক রাত্রে বিলাসিয়া দুটো হাজার টাকার নোট কমলার হাতে দিলে। টাকা তার অদেখা কিছু নয়, কিন্তু তার মোহ ও শক্তিটা অজানা। ইঙ্গিতটুকু বুঝে তার মন গ্লানিতে ভ'রে উঠলো কিন্তু নোট দুটো ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো তার হাতে শক্তি এলো না। বহু কষ্টে কমলা সে-দুটো ফেরত দিলে। বিলাসিয়া বিড়বিড় ক'রে বললে, লছমী ললিতা পাঁচশো টাকাতেই গলে গিয়েছিলো। তাদের দুজনকে কমলা একদিন পাগলের মতো বুকচাপড়ে কাঁদতে শোক করতে দেখলে, যদিও জানলে না যে সে-শোক সম্ভ্রমবর্জনের বহু দামী টাকা চুরি যাবার কারণে, আর চোর বিলাসিয়া নিজে।

কিন্তু কমলার প্ররোচনার চরম হলো আর একদিন। ছুতায় নাতায় বিলাসিয়া তাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে নিজের পিঠ বুক উন্মুক্ত ক'রে দেখালে, উল্‌কি আঁকা বীভৎস যৌনলীলার ছবি তার বুকে পিঠে লেখা। কাশীর নেপালী মন্দির হার মেনে যায় বিলাসিয়ার দেহের কাছে।

কমলার তখন বয়স অল্প। মনের বয়স তার জেলের কৃপায় হু হু ক'রে বেড়ে গিয়েছিলো। রাতারাতি তার দেহের বয়সও বেড়ে

গেলো নূতন উত্তেজনার রোমাঞ্চে, দেহকোষের নূতন জাগৃতিতে। দেহে তার অসহ্য আলোড়ন এলো। মনে ভূমিকম্পের ধ্বংস; আগুন লেগে গেলো তার শান্ত পৃথিবীতে।

কিন্তু গাছের মতো মানুষেরও শিকড় আছে বোধ করি। সে-শিকড় তার সংস্কারে, তার ঐতিহ্যে পরিব্যাপ্ত; গভীরভাবে ছড়িয়ে আছে জীবনের ধারায়, বংশপরম্পরার যম নিয়ম সংযমে। এ-শিকড়ের আর কোনো গুণ না থাক, আত্যন্তিক বাধা ওঠে তার রস থেকে, সেই বাঁচায়, সেইটাই বিপদের হরি, পতনের মুখে অদেখা হাতের সহায়।

কমলার বন্দীদশার অবসান হলো একমাসের নিবিড় নরক-অভিজ্ঞতার পর। বিলাসিয়া দুঃস্বপ্নের মতো দূরে গেলো। তার কলুষ স্পর্শ কমলার গায়ে ক্ষণিকের জন্য লেগেছিলো। সুজাতার নির্মলচিত্তের আগুনে তার ক্লেদ পুড়ে গেলো।

হয়তো কমলার এ-বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিলো। লছমী ললিতা আর লেখাপড়ায় ফিরে আসেনি, কমলা ফিরলো নূতন বল সংগ্রহ ক'রে। এ-অভিজ্ঞতা—এতোটা না হলেও—মানুষ এড়াতে পারেনা। এর থেকে বাঁচা, এর থেকে শক্তি পাওয়াই জীবন। শঙ্করাচার্য যেমন অন্য দেহে প্রবেশ ক'রে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন, আসক্তিতে তাঁর বিনষ্টি ঘটেনি, কমলাও তেমনি বিলাসিয়ার মধ্যে তার আত্মাকে অবগাহন করিয়ে নিয়েও বাঁচলো, তার বিনষ্টি ঘটলো না।

বয়স আর বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমলার মনে এ-উপলব্ধিটা প্রখর হতে থাকলো যে কালতরঙ্গে এসেছে নূতন শক্তির সঞ্চার, সে-শক্তির রূপ যাই হোক সেটা অবিরাম ঘা দিয়েছে মধ্যবিত্তের পুরাতন ধ্যান-ধারণা, আরাম নিরাপত্তার দুর্গের সুগভীর ভিত্তিটায়। জীবনের ধারায় নূতন স্রোত, নানা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত সে-প্রবাহ, সে-স্রোতাবেগ অভিভূত করবেই। নূতনকালের নব নব উত্তেজনার বাঁধাধরা পথ নেই, আসবেই উত্তেজনা বুদ্ধি বিচার সব কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে। সংঘমন ব্যক্তিকে পদদলিত ক'রে যাবে কালের গুণে। বাঁচা কেবল সংঘের মাঝে বাঁচা, আলাদা হয়ে, বিচ্যুত হয়ে বাঁচা সন্ন্যাস হতে পারে কিন্তু সেটা প্রকৃত বাঁচা নয়।

কমলার মনে রাজনীতি ছিলো না। চর্যাপরায়ণ পরিবারে মানুষ হয়ে বিদ্রোহও ছিলো না। তবুও আকস্মিকভাবে উত্তেজনা এলো তার মনে। যুবজন এসে ডাকলো একদিন, ডাকাটাও প্রত্যক্ষ নয়। প্রবাহ যেমন তটভূমিকে ডাক দিয়ে যায় স্রোতে ভেঙে পড়ার জন্য, এ-ডাকও তেমনি। কমলা নিমেষের উত্তেজনায় নূতন বিচিত্র আবহে ঝাঁপিয়ে পড়লো জড়ের মতো কিছু উপলব্ধি না ক'রেই। আবহটা তাকে ভাবতেও দিলে না, শান্ত বুদ্ধির আশ্রয়ও নিতে দিলোনা তখন। হয়তো বা সেটা তার যুবতীমনের বেপরোয়া প্রকাশ, হয়তো বা সেটা তার গড্ডালিকাপ্রবাহে অবশ্যম্ভাবী ভেসে যাওয়া। নিয়তি কমলাকে টেনে নিয়ে গেলো

ভিন্ন দুনিয়ায়। লেখক যেমন কলমকে ছেড়ে দেয় লেখায় তার জীবনদেবতার হাতে, কলম লেখে অচিন্তিত বাণী, আনে অচিন্তিত প্রকাশ, কমলাও তেমনি নিজেকে ছেড়ে দিলে হয়তো তারই জীবনদেবতার হাতে।

গাড়িতে সতীশ আর কমলা। আর কেউ থাকলে কমলার পক্ষে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়ানো দায় হতো। তবুও মেজা রোড স্টেশনে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েই একজন মন্তব্য প্রকাশ ক'রে গেলো আর একটি লোকের কাছে, ছোকরা মেয়ে নয়তো! না জানি ওর বোনের রূপ কেমন, যদি বোন থাকে। গাড়িটা স্টেশন পার হতেই সতীশ হেসে ফেললে, বললে, কম্‌লাজী, যোধপুরী পগড়ি পরলেই মানুষকে রাজপুত বীরের মতো দেখায় না। অন্য স্টেশন এলে আর জানলার ধারে বসে থাকবেন না। কমলাও হাসলো। সতীশ বলতে লাগলো, আসল বিপদ আছে বাড়িতে। আমার বাবা দার্শনিক আর দূরের মানুষ, কিছু নজরে পড়বে না তাঁর। মনে হচ্ছে তিনিই আমার ভরসা। বৌদিরা বোধ করি আপনাকে লুঠ ক'রে নেবে। কিন্তু মা শক্ত লোক। শক্তকে নরম করতে বেগ পেতে হবে, আমার আপনার দুজনেরই। তবে পুরুষের বেশে অন্দরে ঢোকা চলবে না, তাহলে মা ঠাঁই দেবেন না।

মিরজাপুর স্টেশনে সতীশ পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে কমলাকে পাঠসঙ্গী ব'লে পার ক'রে দিলে। পুলিশ মোতায়েন স্টেশনে, কিন্তু কেউ এই সুকুমার মানুষ দুটিকে দেখেও দেখলে না।

দূর থেকে সতীশ তাদের বাড়িটা দেখালে, গঙ্গার ধারে দুর্গের মতো বিরাট চারতলা বাড়ি, তার গায়ে দু'শতাব্দীর প্রাচীনতার ছাপ। সতীশ কমলাকে নিচের তলায় একটা নির্জন ঘরে বসিয়ে ব'লে গেলো, পাঁচ মিনিট বসে থাকুন। এই আপনার শাড়ি জামা, কাপড় বদলে নিন ইতিমধ্যে। প্রসাধনের আপাততঃ উপায় নেই, প্রসাধনে আপনার দরকারই বা কি! কমলা মৃদু হেসে চোখ নামালে। আমি—যুদ্ধের ভাষায় বলি—একবার শত্রুর কেল্লাটায় ঘুরে আসি। সে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

সতীশের বড়ো বৌদি চন্দনা, তার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো। সতীশকে বাড়তি টাকা দেবার সহায়, তার বুদ্ধি খুলে দেবার গুরু, রস-জোগানোয় সখি, অর্থাৎ তার প্রকৃত বান্ধবী। চন্দনা গোলগাল প্রসন্নমুখ অর্ধেক গৃহিনী অর্ধেক বধূ। তার নাসার বেশর মুখটিকে যেন সদাস্নিগ্ধ ক'রে রেখেছে। সতীশ কপট ভক্তিভরে তার পদবন্দনা ক'রে জোড় হাতে বললে, ভাবীজী, দাদা অনেকদিন থেকে আমাকে বলছেন চন্দনাকে ছাড়বো আর একটি স্মার্ট বাঙালিনীকে ঘরে আনবো। তোমার সতীন এনেছি, ঘরে তুলে নিতে হবে।

চন্দনার চারতলার নিভৃত ঘর। সে হেসে বললে, বহুৎ খুব।

তারপর স্বর উচ্চ ক'রে ব'লে উঠলো, খজাঞ্চী, সতীশকো দো লাখ রূপয়া দেনা, ময়নে বকশিশ ফরমায়া। টাকাটা নিও সতীশ। এখন বলো কি বলবে। সতীশের কথা শুনে তার চক্ষু কপালে উঠলো, মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। খানিক ভেবে বললে, কমলা হিন্দি বলে কেমন? বাঙালীদের মতো 'হমকো খায়গা তুমকো খায়গা' বললেই তো গেছি।

তোমার আমার মতোই বলে, সেদিকে ভয় নেই। আর, ইংরিজি বলে চমৎকার।

তা বলুকগে। তাহলে আম্মাজীর কাছে ধরা দেওয়া নয়। মাছ খাবার দায়ে কমলা মারা যাবে। নিয়ে এসো, আমি আশ্রয় দেবো।

তা তো দেবেই, কিন্তু দাদা! কমলা অতিশয় সুন্দরী তা ব'লে রাখছি।

সে তোমার দাদা জানে। ফিরে এলে দেখা যাবে।

কমলাকে সে শ্বাশুড়ীর কাছে নিয়ে গেলো, পরিচয় দিলে, আমার মাসতুতো বোন। জন্মকাল থেকে কলকাতাবাসী এরা। থাকবে এখন কিছুদিন। সতীশের মা চক্ষু কুঞ্চন ক'রে চেয়ে দেখলেন শুধু। কমলাকে দরবারে হাজির করার এতো সহজ অপ্রত্যাশিত ফল শুনে সতীশের ঘাড় থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেলো।

পিতা ভবানীশঙ্করকে না ব'লে থাকা যায় না। চন্দনা বললে,

ভরসা তো উনি, আমার আশ্রয়ের আর জোর কতোটুকু। বিকেলে ওঁকে সব ব'লো আর কমলাকেও হাজির ক'রো।

ভবানীশঙ্কর অরোরা রইস, জমিদার, উকিল, অতিশয় মাননীয় সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি। বয়স ষাট পার হয়ে গেছে কিন্তু যুবকের মতো তাঁর দৃঢ় দেহ। মানুষটির গভীরতার ও ব্যাপকতার সীমা নেই। তিনি কলাবিৎ, আজকালের নিরিখের বাচাল হালকা অগভীর কলাবিৎ নন। বাৎস্যায়ন বর্ণিত চৌষট্টি কলাধর্ম তাঁর আয়ত্তে। নাগরিকতায় তিনি বাৎস্যায়নেরও বোধ করি আদর্শ হতে পারতেন। ভবানীশঙ্কর যা ক'রে দিনাতিপাত করেন কাল-ধর্মের সঙ্গে তার যোগ নেই। তিনি এ-শতাব্দীর আচার অভ্যাসে পা দেননি।

ভোর হবার আগে তাঁর মল্লচর্চা। সূর্যোদয় কাটে বাড়ির ঘাটে সূর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে, মুখে 'জবাকুসুম সঙ্কাশং' ধ্বনি। তারপর সুদীর্ঘকাল অশ্বারোহণ। দিনের বেলা কাছারী যাওয়া না থাকলেও উপনিষদ পাঠের মধ্যে তাঁর কেস-ল' প্রিয়তা ছিলো ; দর্শনশাস্ত্রের মতো আইনের জটিলতা চর্চা তাঁর মানসিক ব্যায়াম। বিকেলে উদ্যানচর্চা, দ্রাসেনা কর্ডিলাইন গোলাপ মনসাকুলের তত্ত্বাবধানে তাঁর নিজের শাদা মাথা মনসার ম্যামিলেরিয়া সেনিলিসের সঙ্গে মিশে যায়। সন্ধ্যায় মজলিস, আলাপ-আলোচনা, একটু সুরা, একটু নৃত্য, বাইজীর ভ্রুভঙ্গবিলাস, স্বরসিদ্ধের সঙ্গীত। তাঁর মধ্যে বিলাস-কৃচ্ছতার সমন্বয় ; তিনি বিষয়ী ব্যক্তি কিন্তু আসক্তিশূন্য।

চীনা তাওপন্থী দার্শনিকের মতো অনেকটা আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা তাঁর দার্শনিকতার অঙ্গ। টান কেবল দুটি জিনিসে, কুস্তির চঞ্চল রক্তপ্রবাহের আবেশে আর মোহিনী রাগিনীতে। যে ওস্তাদ মোহিনীর সুধা তাঁর কানে বষণ করতে পারে তার আর ইহকালের অন্নচিন্তা থাকে না। ভবানীশঙ্করের প্রজাকুলের পুষ্ট একটা অংশ গাইয়ের দল।

চন্দনা শ্বশুর ও সংসারের যোগসূত্র। আর কেউ এ সুমেরু পর্বতের কাছে ঘেঁষে না। ভবানীশঙ্করের সান্নিধ্যে সকলে নিজেকে খর্ব বোধ করে। শুধু চন্দনার ভয়ডর সঙ্কোচ নেই, তার সকল শ্রদ্ধা ভালোবাসা ভবানীশঙ্করের উপর গিয়ে পড়েছে। চন্দনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পর সতীশের ডাক পড়লো, তারপর চন্দনা কমলাকে ডেকে নিয়ে গেলো।

গঙ্গার দিকে ঘর, বারদুয়ারীর মতো। সূর্যের উদয় অস্তের কিরণ আসে ঘরে। বিরাট একটা গালিচা মোড়া ঘরটায়, বই চারিদিকে। ভবানীশঙ্করের তাকিয়ার এ-পাশে ও-পাশে বইএর স্তূপ। ফরসি থেকে তামাকের গন্ধ ভুরভুর করছে ঘরটায়। কমলাকে দেখে তিনি বললেন, আও বেটি। অপর দুজন আদেশ পেলে, আপ যা সকতে হ্যায়। কমলা বসলো তাঁর পায়ের কাছে, তার চোখে পড়লো রক্তরাঙা পদতল, আশ্চর্য গঠন তার। মাথা তুলে দেখলে তঞ্জেবের জামাপরা পরম ঐশ্বর্যবান পুরুষ, কবাটবক্ষ শালপ্রাংশুভুজ।

নীরবে মিনিট খানেক কেটে গেলো। কমলার কানে এলো, তোমাকে দেখছিলুম বেটি, আকাঙ্ক্ষা ছিলো দেখবার। আমি সেকেলে ট্রাডিশনল মানুষ, ধর্ম ঐতিহ্য আচার বিলাস পুরনো ধ্যান-ধারণা -- নানা কিছুর খুঁটিতে বাঁধা। সংস্কার আর আবেগের দ্বন্দ্ব আমার মনে চিরন্তন, তা অতিক্রম ক'রে বাঁচার আমার যো নেই। তুমি নূতন, তুমি পলিটিকল মানুষ, মুক্ত নিরঙ্কুশ, আপনার লীলায়, আপনার প্রাণধর্মের বিস্তৃতিতে বাঁচা বেড়ে ওঠা তোমার কাজ, ওই তোমার নিয়তি। তোমাকে যেন খুঁজছিলুম মনে মনে। অনেক কাল থেকে আমার আত্মায় সাড়া দিয়েছো তুমি। তুমি থাকো নির্ভয় হয়ে। তুচ্ছ কোনো ত্রুটিকে তুমি গ্রাহ্য করবেনা তা জানি।

কমলা তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলো। ভবানীশঙ্করের ওষ্ঠ ও চোখের ভঙ্গিমায় তার মনে হলো, এ নির্ভয় দেওয়া ফাঁকি নয়, মুখের কথা নয় শুধু, এ দুর্গতি সহজ-করা আশ্বাস। সে চুপ্ ক'রে রইলো। 'ধন্যবাদ' কথাটা তার জিভের ডগায় এসে পড়েছিলো, কমলা জিভ কাটলে; ও মৌখিক সৌজন্য ভবানীশঙ্করের সামনে প্রকাশ করতে তার সঙ্কোচ হলো।

সতীশ তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছে জানি, তার সাথীও তুমি নও। আমরা সেকেলে মানুষ, পরিচয় চাই যদি রাগ ক'রোনা। না না, বিদ্যার পরিচয় নয়, সে তোমার মুখে লেখা।

আমার বাবা উকিল ছিলেন, পিতাজী, নাম যামিনীবাবু, অনেকে চিন্‌তো তাঁকে।

ভবানীশঙ্কর ফরসির নল ফেলে চকিতে সোজা হয়ে বসলেন। তুমি যামিনীর মেয়ে? তোমার বাবা আর আমি একসঙ্গে আইন পড়েছি। এই ঘরে তোমার বাবার কতো দিন কেটেছে। তাঁর বিয়েতে আমি ছিলুম প্রধান বরযাত্রী। সুজাতা, তোমার মা'র নাম সুজাতা, নয়? কমলা হাঁ বললে। সে-কথা ভবানীশঙ্করের কানে গেলো না। তাঁর মন পিছিয়ে গেলো চল্লিশ বছর। চোখের সামনে জেগে উঠলো এক শ্রাবনসন্ধ্যার ছবি, একটি তরুণী মুখ। সে-মুখ পূর্ণ ক'রে আর মনে নেই কিন্তু প্রভাব তার দাগ দিয়েছিলো ভবানীশঙ্করের মনে, তাঁর ইচ্ছে হয়েছিলো জাত বদলে জন্ম বদলে বাঙালী হবার।

সিঁড়ির কাছে চন্দনা দাঁড়িয়েছিলো, কমলা নিকটে আসতেই চন্দনা তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললে, কম্‌লা বহ্‌ন্, তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম। সরকার বাহাদুর হাজার রূপেয়া ইনাম দেবে, আমি আর সতীশ আধাআধি ক'রে নেবো। সতীশ দাঁড়িয়েছিলো সিঁড়ির মাথায়, তার হাতে "ভারত"। ওরা উঠে যেতে চন্দনা কাগজটা নিয়ে দেখালে, পুলিশের পুরস্কার ঘোষণা, আগের চেয়ে পুরস্কারের অঙ্কটার বৃদ্ধি। তাতে কমলার ছবি নেই কিন্তু বর্ণনা আছে। কমলার মুখে রক্তস্রোত খেলে গেলো। চন্দনা বললে, আমার চেয়ে বড়ো দারোগা আর কোথায়! কানে কানে বললে, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে এক আশিক, পুলিশের বাবার সাধ্যি নেই।

চন্দনা কমলাকে ঘর দিলে চারতলাতেই, গঙ্গামুখী ঘর। বললে, সব বাঙালীই কবি, তোমার কাটবে ভালো। কবিতা লেখো শুনিও,

না লেখো, আমার পিছনে পড়ো, আমাকে বাঙালী বানাও। এ বাড়িতে কর্তাই কেবল সরু তারে বাঁধা বীণের মতো, তাঁর ঝঙ্কনাতেও মাধুর্য আছে। আর, আমরা সব ধুনুরীর তাঁত, তাতে বাজে তুলো-ধোনার গৎ, কিন্তু তুলো ধোঁনেনা, রস ধোনে। আলোড়নে রস গেঁজে গিয়ে তাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু ও-কথা থাক। সতীশ যে বলে, লেখাপড়া উঠে গেছে, কালেজ বন্ধ, আর ফিরে গিয়ে দরকার নেই। সত্যি বন্ধ নাকি, না আর কিছু?

কমলা হাসলো, বললে, সত্যি বন্ধ; আর কিছুর খবর আমার জানা নেই। সতীশ মাথা নিচু করলে। চন্দনা তাকে বললে, আপ শরীফ লে যাইয়ে মেহরবান- সতীশ তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালালো।

চন্দনা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, পিতাজী না ডাকলে তুমি নিচে যেওনা। ও-ইস্তাহার দেখে আমার ভয় হচ্ছে। পুরুষ চাকর কেউ অন্দরে আসেনা কিন্তু চাকরানীরা আসে। এ-মহলে আমার বুড়ি দাই ছাড়া অপরের ওঠা বন্ধ ক'রে দেবো। বাঘের ঘরেও সাপ ঢোকার ছিদ্র থাকে।

আগুন জ্বালাবার,ধ্বংস করার নেশা অসীম। নেশা না হলে কোনো স্থির শান্ত মানুষ ভেবেচিন্তে এ সকল মরিয়া কাজ করতে পারে না। যারা আবেগময় তাদের নেশা ধরে সহজে। ভীতু যারা তারা প্রথমে ভয় পায়, পা ফেলার আগে পা ঘসে ইতস্ততঃ ক'রে, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়লে আর তাদের ভয় থাকেনা। কমলার না ছিলো আবেগ, না ছিলো ভয়। কিন্তু তবুও আকস্মিকভাবে আবেগ ছাপিয়ে গিয়েছিলো তার মনে। সে ভয়ের কথা ভাবতো আর তার '*Journey's End*'-এর গল্প মনে পড়ে যেতো। নেশায় ভয় কেটে যায়। ডেনিস ভিক্টোরিয়া-ক্রস্‌ধারী বীর। সর্বদা সে নেশায় চুর, পকেটে তার চেপ্টা মদের বোতল। এক ভীতুর মুখে জোর ক'রে মদ ঢেলে ডেনিস বলেছিলো, কে বলে আমি বীর! আমিও ভীতু তোরইমতো। যা করেছি নেশায় করেছি, মদের নেশায়, যুদ্ধের নেশায়! *Brandy makes heroes of cowards.* শুধু কি বোতলবাহিনী ব্র্যাণ্ডি! কতো মদ আছে আকাশেবাতাসে ছড়িয়ে।

আগে অন্দরে চন্দনার জন্য কাগজ আসতো হিন্দি "ভারত," কমলার জন্য ইংরাজি কাগজও আসতে লাগলো। বালিয়া, আজমগঢ়, বেহারের নানাস্থানের কাহিনী আসতে লাগলো এই সব কাগজের পথ বেয়ে। কমলার হাত নিসপিস করতো; কিছু করবার রাস্তা নেই, চোখ বন্ধ ক'রে সে কল্পনায় ধ্বংসে মত্ত হয়ে যেতো। নিজেকে ধিক্কার দিতো আবার রমণী হ'য়ে যাবার জন্য।

দেশসেবক যারা তারা দেশের উপলব্ধি আগে ক'রে পরে মাতে। কমলা আগে মেতে পরে দেশের উপলব্ধি করতে লাগলো। এ দায়ে-পড়া বিশ্রাম নিষ্ক্রিয়তা ঘাড়ে এসে না পড়লে দেশের কথা তার মনেই আসতো না। কিন্তু মাদকতা না হলে যুবজীবন প্রেরণাহীন। কালেজে অঙ্ক কষার, ল্যাবরেটরির গবেষণায় তার তন্ময়-করা নেশা ছিলো। তখনো সময় ছিলোনা দেশকে ভাববার। এ-আগুনের নেশায় তাকে না ধরলে হয়তো তার বিজ্ঞানী-মনের চুলচেরা বিচারে দেশ ঠাই পেতো না। তার তন্ময়তা ছিলো সীমাহীন আকাশ, বায়ুতরঙ্গ, বিচ্ছেদহীন আলোর রাজ্য নিয়ে। সেখানে গণ্ডী নেই, দেশের সঙ্কীর্ণতা নেই, জাতির, বিশিষ্ট সংস্কৃতির বিভাজন রেখা নেই। আগুন না জ্বালালে তার বাস হতো বিজ্ঞানীর বিশ্বজনীনতার রাজ্যে।

আগুন জ্বালিয়েই কমলার মনে এলো, অহিংসা কি? পৃথিবীটাই তো তার নখরদন্তে চিরকাল রক্তরাঙা। এ রুধিরপ্রবাহ কোনোদিন থামেনি, থামবেও না, প্রকৃতি যোগান দেবে ধ্বংসের রসায়ন।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। সুন্দর হয়তো বোঝা যায় নিজের অনুভূতি নিজের অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে। কিন্তু শিব কি, কল্যাণ কি, কোথায় তাদের আবাস? সব চেয়ে বড়ো প্রশ্ন, সত্য কি? সেটা কি উদ্‌ভ্রান্ত মানবের গড়ে-নেওয়া মায়া, মরীচিকা? সত্য কি কালের নিরিখের একটা চলতি অর্থ, না, চিরন্তন? সূর্য সত্য, চন্দ্র সত্য, সাগরের তরঙ্গ সত্য, মৃত্যুর অবসান সত্য, কিন্তু মানুষের বুকের সত্যটা কি? কোথায় তার স্থান? সত্যের ঢাক বাজানো আছে চারিদিকে কিন্তু তার স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই কোথাও, ধরতাই বুলিটা চলে এসেছে চিরকাল। সংজ্ঞা না হলে আজকের মানুষের তৃপ্তি নেই। পরমাণুর সংজ্ঞা আছে, অ্যামিবা প্রোটোপ্লাজমের সংজ্ঞা আছে, কিন্তু সত্যের সংজ্ঞা কোথায়? নিসর্গের বাইরে অম্লান চিরন্তন সত্যই বা কই? সত্যসন্ধানীরা কি অধ্যাসে হ্যালুসিনেশনে ডুবে আছে? বিবেকের বাণী সত্য? বিবেক তো *Conditioned reflex*! তাহলে বুদ্ধ গান্ধি রবীন্দ্রনাথের সত্য যেমন চেঙ্গিস খাঁ হিটলারের সত্যও তেমনি সত্য; তার নিজের আকস্মিক উত্তেজনাও প্রগাঢ় সত্য কথা। তবুও—কমলা ভাবে—হোক সত্য অজানা অলব্ধ। কিন্তু আপনার মহিমা দিয়ে সেই অলব্ধটাকে বড়ো করেছেন, কাম্য করেছেন বুদ্ধ গান্ধি রবীন্দ্রনাথ।

এ-ভাবনার কূলকিনারা নেই, একা হলেই কমলা ভাবে। সেদিন বারান্দায় ব'সে সে সীমাহীন ভাবনা ভাবছিলো।

আকাশে প্রভাত ভানুর তিলক। নবীন আলোক-পর্যায়ের রঙে

আকাশে বিচিত্র সম্ভার। হঠাৎ কমলার নিচে নজর পড়লো। ঘাটে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখীন ভবানীশঙ্কর। কৌষেয় বস্ত্র কোমরে দৃঢ় ক'রে বাঁধা, নগ্ন দেহে মোটা শুভ্র যজ্ঞোপবীত, পায়ে ভিজা খড়ম। যেন কর্ণ পিতা সূর্যদেবের বন্দনায় রত। কানে তাঁর সুবর্ণকুণ্ডল নেই কিন্তু বক্ষে বাহুতে কর্ণেরই মতো দৃঢ় পেশীর সহজাত কবচ। জবাকুসুমসঙ্কাশ প্রভাত ভানু যেন ভবানীশঙ্করের ঋজু দেহকে প্রতীক ক'রে সমগ্র ধরণীতে আশীর্বাদ বিতরণ করছে—আলোকের, জীবনের, প্রাচুর্যের আশীর্বাদ। কমলার আজ প্রথম চোখে পড়লো, ভরা গঙ্গার পটভূমিকায়, উষার আলোয় সদ্যস্নাত বন্দনারত মানুষের কি সুন্দর রূপ। তার হঠাৎ মনে হলো এই রকম মানুষ দিয়েই বুঝি বা দেশ ও ঐতিহ্যের প্রকাশ। এই তো ভারতবর্ষ! মানুষ বন্দনার জন্য যত্রতত্র ইটকাঠের মন্দির গড়েছে, কিন্তু সমগ্র নিসর্গকে, তট-প্রবাহিনী নদীকে সাক্ষ্য রেখে বিশ্ববন্দনায় ভারতের আত্মার অপূর্ব মহিমা।

সেদিন বিকেলে ভবানীশঙ্কর কমলাকে ডেকে পাঠালেন। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে কমলারও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিলো। সে ঘরে গিয়ে নত হয়ে নমস্কার করতেই ভবানী স্মিতমুখে বললেন, আসন রক্‌খো বেটি। আনন্দ সে হো? ডাকলুম তোমার খবর নেবার জন্য।

কমলা উত্তর দিলে, জী। কিন্তু আনন্দের কিছু খুঁজে পেলে না।

চন্দনা তাকে আনন্দে রাখবার চেষ্টা করে কিন্তু তার এ-কিছুদিনের জীবন স্বাদবর্ণহীন।

তুমি আসার পর থেকে ভাবছিলুম কমলা। দেখি আমিও সরকারের উপর কম বিরক্ত নই। পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের জমিদার আমি, সুখ আছে, খানিকটা নিরাপত্তা আছে, কিন্তু নিগড়ে বাঁধার দুঃখও আছে। অনিচ্ছায় যত্তো অর্বাচীনদের সামনে কোমর ঝুঁকিয়ে সেলাম দিতে দিতে কোমরের বেদনা গেলোনা। আমার সব চেয়েও বড়ো নালিশ, মুঝে সি আই ঈ বনাকর সরকার বাহাদুর নে মেরে শুভ্‌নাম পর স্যাহী ডাল দিয়া। কথাটা ব'লে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, কমলাও হাসলো।

কিন্তু সে কথা থাক। তোমার নির্বাসনের কষ্ট কিসে লাঘব হবে বলো। কিছুতে মন না লাগলে সুখ নেই। কিছুতে মন লেগেছে কি ?

কমলা মৃদু হেসে মাথা নত করলে। বলতে পারলে না, মন লাগেনি। বলতে পারলে না, সুখ কেন স্বস্তিও নেই। সে আত্মীয় নয়, বন্ধুও নয়, অতিথি নয়, কুড়িয়ে পাওয়াও কেউ নয়, বিপজ্জনক দায়-ঘটানো ঘাড়েপড়া আবর্জনা।

ভবানীশঙ্কর যেন তার মনের কথাটা বুঝতে পেরে একটু হেসে বললেন, বেটি, যা ভাবছো তা ভেবোনা। সুখ পাওয়া সহজ কথা নয়। কি সুখ চাই তা যদি নিশ্চিত জানো সেটা পাবার প্রয়াস আছে। না না, কোনো ফিলসফি মনে ক'রে চোখ তুলে তোমাকে

প্রতিবাদ জানাতে হবেনা। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে সুখের ছেলেমানষী নিরিখ ব'লে দি, *If you want to be happy for an hour, feast; if you want to be happy for a day, marry; if you want to be happy for ever be a gardner.* তিনি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন, কমলাও হেসে ফেললে। চলো, আমার বাগান দেখবে। আমার মতো মালী হতে পারো, দুঃখ কাছে ঘেঁষবে না তোমার। অঙ্কুরপাত থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত যে সাক্ষী থাকে তার আনন্দ ভগবানও কেড়ে নিতে পারেন না। এসো আমার সঙ্গে।

গঙ্গার দিকে ফুলের বাগান। একটা মুণ্ডবিহীন পাথরের থামে প্যাশন ফ্লাওয়র লতা বেগুনী রঙের চমৎকার ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। নানাপ্রকার ম্যাগনোলিয়ায় ফুলের সম্ভার। মৌমাছি দিশাহারা চারিদিকে, মধুসংগ্রহের তাড়ায় ভন্‌ভন্‌ ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভবানীশঙ্কর ঘুরতে ঘুরতে কমলার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন। কমলা আকৃষ্ট হয়ে য়ক্কার মোমের মতো বিচিত্র ফুলের গুচ্ছটার দিকে তাকিয়ে ছিলো। অনেকক্ষণ পরে একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ভবানীশঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গাছ বোঝ বেটি? এটা হ্যামহার্সটিয়া, এ-দেশে সহজে হয়না, বহুকাল অপেক্ষা ক'রে আছি এর ফুলের জন্য। পাশের এই গাছটা আমাকে আঠারো বছর অপেক্ষা করিয়ে আশা পূর্ণ করেছে শেষকালে।

কমলা চুপ ক'রে রইলো। তার বিদ্যা বট্যানির খানকয়েক বই

আর কালেজের ক্ষুদ্র বাগান পর্যন্ত, গাছ ঘাঁটা রুচি তার হয়নি। চলতে চলতে ভবানীশঙ্কর মনসার কাঁটা বনে গিয়ে পড়লেন, বললেন, এই আমার সব চেয়ে বিদখুটে শখ।

কমলা উৎসাহিত হয়ে ব'লে উঠলো, কিন্তু ভারি বিচিত্র দেখতে তো! আমি আগে অল্প কিছু দেখেছি, এতো দেখিনি। কিন্তু এ-বিষয়ে পড়তে হয়েছে তার চেয়ে বেশি।

পড়েছো নাকি? আশ্চর্য তো! বলতে পারো এটার নাম কি, এটার, এটার?

চারটে গামলার কাছে তুজনেই ব'সে পড়লেন। কমলা পর্যবেক্ষণ ক'রে বললে, এটাতো সিরিয়স জাতীয়, সম্ভবতঃ পাইলোসিরিয়স সেনিলিস। এটা সোজা. ম্যামিলেরিয়া সেনিলিস, আর, এটাও সর্বজন পরিচিত, একিনোক্যাক্টস্। এটাকে ম্যামিলেরিয়া মাইক্রোমেরিস ব'লে মনে হচ্চে যেন।

তুমি ঠিকই বলেছো, আমার সন্দেহভঞ্জন হলো। আর যা হোক, তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেলে বেটি। তুমি আমি মনসা গোত্রের নিকটতম আত্মীয়, কি বলো? মনসা কি জানো কমলা? কাঁটায় কাঁটায় বৈচিত্র্যে আমাদের জীবনের প্রতীক। ওতে যেমন ফুল ফোটে জীবনেও তেমনি ফুল ফোটে কাঁটাকে ছাপিয়ে, হার মানিয়ে। অধিকাংশ মনসার ফুল ফোটে রাত্রে,আলো ধ'রে দেখতে আসি। মনের ফুলও ফোটে অগোচরে অন্তরীক্ষে। রাত্রির সাধনা না থাকলে মানুষ বোধ করি চিন্তায় কর্মে বাড়তো না, বড়ো

হতোনা। কি বলো, বিদুষী মেয়ে? ভবানীশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখলেন।

কমলা মৃদুস্বরে বললে, হিন্দি বা ইংরাজিতে বলতে পারছিনে, কিন্তু আমাদের কবির কথা আছে—

"কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে,
ওরে অবোধ জানিসনে তুই তাকি?"

সকল কাঁটাতেই ফুল ফোটে. সকল কাঁটা ধন্য ক'রে গোলাপ হয়ে ফোটে বোধকরি পিতাজী, কিন্তু অবোধ তা জানতে পারে না।

আবার বলো, আস্তে আস্তে বাংলাতেই বলো, আমি বুঝতে পারবো। বার বার শুনে তিনি বললেন, অবোধও জানতে পারে বৈকি বেটি, এই যেমন তুমি জেনেছো নিজের বিকাশকে, যা না জানলে তুমি বিয়ে-থা ক'রে সংসারযাত্রায় লিপ্ত হয়ে কাঁটার বনের অবোধ মানুষ থাকতে।

আপনি বিদ্রোহ সমর্থন করেন পিতাজী?

করি আবার করিওনে। বিদ্রোহ না হলে ভাঙন কোথায়? ভাঙন না হলে আত্মার মণি-কোঠায় যাবার পথ কোথায়! আমি রেওয়া রিয়াসতে রুবি পাথর অন্বেষণ দেখেছি। এক তাল পাথর, সেটাকে হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে ভাঙে ওরা। সেই চূর্ণ থেকে মণি ছড়িয়ে পড়ে, তারপর সে-মণি শানে চড়ে। ভাঙন না হলে শানে চড়বার

মতো, পরিশীলিত হবার মতো বস্তুটি পাবে কোথায় ? বিদ্রোহ জীবনকে শোধন ক'রে নেবার যন্ত্র বেটি। মৃত যা সেটাকে সে ত্যাগ করে, মৃতকল্পকে নাড়া দিয়ে দেখে, তাকে পুনর্জীবিত করা যায় কিনা। ঐতিহ্যকে খতিয়ে দেখে, তা থেকে অবান্তরকে মৃত অংশকে ফেলে দেয়। এ পরিশুদ্ধির আগুন আসেই যুগেযুগে। মৃত্যু শেষ, মৃত্যু ধ্রুব। বিদ্রোহ মৃত্যুর সহায় নয়, সহায় জীবনের। বাঁচাকে প্রকৃত বাচার উদ্দীপনা দান করে এই বিদ্রোহ। আর, বলবো ? তোমার বিরক্তি লাগবে না তো ? লাগবে বোধ হয়। আজ থাক্।

লাগবে না পিতাজী, আপনি বলুন।

না, এখন থাক্। পাঁচিলের কাছ থেকে কে তোমাকে দেখে সরে গেলো। তুমি ভিতরে যাও। তোমার মাথাটা যে দামী আমি তা ভুলে গিছলুম।

উপরে যাবার সিঁড়ির মুখে একটা চাকর সেলাম ক'রে তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিলে, তাতে লেখা আছে, দয়ানন্দ্। দয়ানন্দ্ এখানে কেন ? কি চায় সে ? উপরে উঠতে উঠতে কমলা ভ্রূকুঞ্চিত করলে। সে আশ্রয়দাতা বটে, কিন্তু আশ্রয় দান করার ভিতর থেকে সে কোনো উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছে নাকি ?

সতীশ সাড়া দিলে পর্দার ওপার থেকে, আমি সতীশ, কম্‌লাজী, দরবার মে কুছ পেশ করনা হ্যয়। কমলা পর্দার বাইরে হাসি মুখ বার ক'রে বললে, বেগম সাহবার ফুরসৎ আছে পেশি শোনবার,

ভিতরে এসো। সতীশ পাপোশের উপর দাঁড়িয়েই বললে, আপনার ফুরসৎ হলে কি হবে, ভাবীজীর হুকুম নেই আমার এ-নূরমহলে আসবার। ব'লে যাই শুধু, দয়ানন্দ্ এসেছে আজ দুদিন, আপনার দর্শনাভিলাষী ; পেড়াপীড়ি করছে ভয়ানক। কি বল্বো তাকে ?

নূরমহলের নূর—আলো কে সতীশ ? আমি, না, কম্‌লা বহন্ ?

বলতে বলতে চন্দনা ঘরে ঢুকলো।

সতীশ জবাব দিলে, কম্‌লাজী খোদাতালার নূর, দেশের নূর। দিবারাত্র ওঁর আলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর, তুমি ভাইসাহেবের নূর, ভাবীজী, যদিও দাদার দাড়ি নেই। তিনজনেই হাসলো ওরা।

চন্দনা কমলার কানে কানে বললে, ওই মুগ্ধ ছোঁড়াটা তোমাকে শনম কা নূর বলেনি, এই রক্ষে। 'শনম্ কা নূর' প্রেমের আলো। কমলা মৃদু হেসে মাথা নিচু করলে।

সে সতীশকে বললে, দয়ানন্দ্‌কে ব'লে দাওগে, দেখা এখন নয়, আজ নয়। আর কোনোদিন হতে পারে। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের ঘরের নিয়ম এখন আমি মানতে বাধ্য। সতীশ চলে গেলো।

এ দয়ানন্দ্‌কে কম্‌লা ?

আশ্রয় দিয়েছিলো, এখন বোধ করি আশ্রয় দেবার দাম চাইতে এসেছে। তোমার কি মনে হয় ? এইবার আমার জীবন-নাটকের প্রকৃত আরম্ভ হলো বোধকরি।

চন্দনা অভিজ্ঞ মেয়ে, জীবনকে আয়ত্তে রাখতে প্যাঁচও জানে, রসও বোঝে। কমলার গম্ভীর মুখের কথা শুনে মুচকি হেসে বললে, নাটকের ভয় করো নাকি? যদি নাটকের মতো নাটক হয়? এই ধরো যেমন রাধার?

কমলাও হাসলো, বললে, চন্দন, ভয় হয়তো করিনা, কিন্তু তার বিস্ময়কে না মেনে উপায় নেই। সেই বিস্ময় আর তোমরা যাকে ভয় বলো সে দুটোই আমার কাছে এক। আর যাই হোক, নিজের জীবনকে নাটক ক'রে তোলা বড়ো জঞ্জাল। কিন্তু এর মধ্যে রাধা বেচারী কেন? তার কলঙ্ক তো আজও ঘুচলো না।

চন্দনা চট ক'রে বললে, লেখাপড়া শিখে এই বুঝেছো বুঝি? ও কলঙ্ক ঘুচলে কি রসের সাগর শুকিয়ে যেতো, পৃথিবীর ক্ষতিটা যে কি পরিমাণে হতো তা যদি জানতে! কলঙ্ক বড়ো মিষ্টি। রাধা গেলে তোমার আমার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে কম্‌লা। তোমার মনেও রাধা আছে, আমারও আছে, নেই? অপেক্ষা খালি ভাগ্যের ডাকের। চন্দনা সরবে হেসে উঠলো, কমলাও হাসলো। হাসি থামিয়ে চন্দনা বললে, কম্‌লা বহন্, নাটককে আহ্বান ক'রে নাও। যেদিন বলতে পারবে, মুঝে দর্দে জিগর নে সতায়া, সেই দিনই তুমি সার্থক। বুকের ব্যথার দুঃখ না বুঝলে নারী হবে কি ক'রে আর! বাড়ির নিচে দিয়ে গঙ্গা না বয়ে যদি যমুনা বয়ে যেতো আমি রাধা হয়ে গিয়ে দর্দে জিগর নিয়ে হা-হুতাশ করতুম।

কিন্তু গঙ্গা বড়ো বেঁয়াড়া নদী, তার রঙে সন্ন্যাসীর গৈরিক, তার তীরে অন্ত্যেষ্টির ইঙ্গিত শুধু, ও-তীরে কুল খোয়ানোর উপায় নেই। তার ওপর পিতাজী স্তব আরাধনা ক'রে ক'রে এ-বাড়ির আর ও-নদীটার মাথা খেয়ে রেখেছেন, কি করি!

ওরা আবার সুতীক্ষ্ণ মনখোলা হাসি হেসে উঠলো। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো পুঞ্জীভূত কালো মেঘে। ভীম গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর ধারায় বৃষ্টি নামলো। চন্দনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কমলা মেঘ দেখে ভাবছিলো, ক্যুমুলো-নিম্বসের পুঞ্জ, এখনি ঝড়জল নামবে প্রচণ্ড বেগে। চন্দনাও কথা কইতে কইতে শুনছিলো দূরের কোন ঝুলনা থেকে যুবতীকণ্ঠে গান ভেসে আসছে কাজর বদরিয়ার।

"সব সুখি বাগিয়া হরি লুই,
ঘন শ্যাম বদরিয়া ছায়ী রে
কাজর বদরিয়া ছায়ী---"

মিরজাপুরী বধূ, কাজর বদরিয়া ঝুলনা আর কজরী তার রক্তে ওতপ্রোত ক'রে মেশানো। কমলা নিম্বস বোঝে বদরিয়া বোঝেনা। নিম্বস ঝঞ্ঝাভরা হলেও রসহীন মেঘ, বদরিয়া রসের বিশ্ব, তাতে অন্তর্মথিত বেদনা—কবির, প্রিয়ার, অভিসারিকার, প্রোষিত-ভর্তৃকার। চন্দনা দীর্ঘশ্বাস ফেললে কেন কে জানে!

সে একটু পরে বললে, কম্‌লা, সন্ধ্যাবেলা ঝুলনায় ঝুলবে? বিদ্রোহের চেয়ে রসালো জিনিস।

সন্ধ্যায় ওরা অন্তঃপুরের বাগানে গেলো। চন্দনার সঙ্গে এলো তার বিধবা জা, কমলা তাঁকে দূর থেকে দেখেছিলো। চন্দনা আগেই বলেছিলো, সতীশকে ঝুলনায় ডাকবো না, তার মাথা বিগড়ে যাবে ঝুলনার মাদকতায়। ঝুলনা আর যুবতী মেয়ের সমন্বয় এ-দেশের সোমরসের চেয়ে কম মাদক নয়। ডাকবো জা'কে. কিন্তু সে যেন না জানতে পারে তুমি কে।

কমলা জোড় হাত তুলে বললে. নমস্তে বহনজি। পদ্‌মা হাত তুললে না, মৃদু হাসলে। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

মানুষের সকল সম্বন্ধের মধ্যে এক-শখের জ্ঞাতিত্বটা সব চেয়ে বড়ো। মনসাকুলের ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে কমলা বেশি ক'রে ভবানীশঙ্করের মন কেড়ে নিয়েছিলো। কাজেই সে এখন ভবানীশঙ্করের দরবারী. সকাল থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতো কখন তিনি একা হলেই ওর ডাক আসবে।

সেদিন তিনি কমলাকে দেখেই সোজা হয়ে বসলেন। ফরসির নল হাত থেকে নামিয়ে রোজকার মতো বললেন, আসন রক্‌খো। আনন্দ সে হ্যঁায় আপ ? এক বিষয়ে তোমার অনুমতি নেওয়া হয়নি কম্‌লা। তোমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রেই তোমার সামনে তামাক খেয়েছি। অনুমতি নেবার ও ইংরাজি সৌজন্যটা ভালো। ধোঁয়া আমার মিষ্টি লাগতে পারে কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা কষ্টদায়ক। বোধ হয় তোমাকে সম্পর্কশূন্য লেডি মনে করিনি তাই ক্রটি হয়ে গেছে।

কমলা মাথাটি নিচু ক'রে সসম্ভ্রমে উত্তর দিলে, আমার কিছুই মনে হয়নি পিতাজী।

তোমার কথা আজকাল যখন তখন খুব ভাবছি। তোমার পড়ার বইগুলো আনিয়ে দি? কি বলো? কিন্তু আরো জানবার এই তোমার অবসর। আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যদি মোকাবিলা করবার চেষ্টা করো, বেশ হয়। তোমরা মাত্র গোটা পঞ্চাশ বছরকেই জানো, আর, আমাদের চেয়ে তা বেশি ক'রেই জানো। কিন্তু হাজার হাজার বছরের কাছে পঞ্চাশ বছর আর কতোটুকু!

কমলা চুপ ক'রে রইলো। ইচ্ছা হলো বলে, এখন আমি গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ডুব দিয়ে আছি। কিন্তু বলতে পারলে না।

একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, বেটি, আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যৌবনে অনেক পাখি জানোয়ার মেরেছি অন্য ভবানীশঙ্করের কালে। সে ভবানীশঙ্কর ছিলো শিকারোন্মাদ ব্যাধ. বিন্ধ্যগিরির অরণ্য তাকে রাত্রিবেলা কুহক বিস্তার ক'রে অস্থির করতো। আমি আজও দেখি আমার হাত দুটি নিরীহ রক্তে ভরা। ইতর প্রাণীর রক্ত ব'লে মনকে আর প্রবোধ দিতে পারিনে। মানুষের রক্তের মতো সে-রক্তেও একই রকম জীবন-কণিকা, একই জীবনস্রোত। আমার পাপক্ষয় নেই। কিন্তু তুমি যদি মানুষ মেরে থাকো, মেয়ে?

তাঁর হঠাৎ প্রশ্নে আর স্বরে কমলা শিউরে উঠলো। উজ্জ্বল চোখে সে মাথা তুলে ভবানীশঙ্করের দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে। এই তো তার মনের বিরামহীন প্রশ্ন! এ-প্রশ্ন তার নিভৃত

ভাবনার সঙ্গী। সে নিয়ত স্বপ্ন দেখে, জ্বলন্ত লরিটার ভিতর একটা মানুষের ভস্মীভূত দেহের অঙ্গার।

জানিনে পিতাজী কাউকে হত্যা করেছি কিনা, কমলা ধীরে ধীরে বলতে লাগলো। হয়তো করেছি। আগুন দেবার জন্য অনুতাপ আমার নেই। উত্তেজনায় আগুন জ্বালিয়েছি বটে কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, আগুন ধরানো মুক্তি কামনার অঙ্গ। এই তো আগুনের আরম্ভ। কিন্তু মানুষ হত্যা করার কথা ভেবে শান্তি পাইনে, তা সে যতো বড়ো অপরাধীকেই হত্যা করিনা কেন।

ধোঁয়ার মাঝ থেকে মৃদুস্বরে প্রশ্ন এলো, তবে? এতোদূর পর্যন্ত আমিও ভেবেছি, এর পর আর আমি ভাবতে পারিনে। তুমি বিদ্রোহী, তুমি হয়তো বলতে পারো, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

পারি কি? কে জানে! কিন্তু বিচারবুদ্ধির বাইরে, উপলব্ধির গভীরতায় এই কথাটাই বুঝি যে দেশের মঙ্গলাচরণে যদি নরবলিই দিতে হয় সম্যক হিতের জন্য, আমার প্রতিবাদ করবার, সঙ্কুচিত হবার কিছুই নেই।

ভবানীশঙ্কর আগ্রহে সমুখের দিকে ঝুঁকে বসলেন: তারপর? তুমি যখন আপনার সত্তায় ফিরে আসবে, তখন? তারপর? তুমি শুধু দেশের নও, সংঘের নও, সমাজের নও, তুমি নিজেরও। তোমার আত্মা তোমারই। সাময়িক সত্য, চিরন্তন সত্য, তোমার উপলব্ধিগত সত্যের বিবিধতা কল্পনার নয়, তাদের মূল্যও এক, অক্ষয়, অব্যয় নয়। তারপর?

কমলা বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে ভাবতে লাগলো। ভবানীশঙ্কর যেন হতাশ হয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে ফরসির আশ্রয় নিলেন। ঘরে ফরসির মৃদু শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ নেই। দূরে কজরীর সুর, গঙ্গার স্রোতে ঝিকিমিকি দ্যুতি। অনেকক্ষণ পরে কমলা মাথা তুললে।

বলো বেটি।

তাহলে বাকি সারা জীবন ধ'রে অনুতাপ করবো পিতাজী! মনের সে-দাগ মুছে যাবেনা। হয়তো সারা জীবন ধ'রে চোখের জলের তর্পণও করতে পারি।

কমলা, বুঝলুম এ-প্রশ্নের সমাধা নেই। যদি অনুতাপ আর চোখের জলের তর্পণ বিশ্বনিয়ন্তা যথেষ্ট ব'লে গ্রহণ না করেন? সমসাময়িক সমাজ তোমাকে হিরোইন, বীরনারী ব'লে দুন্দুভি বাজিয়ে বরণ করুক, কিন্তু তোমার রক্তধারা দিয়ে যদি সে-কলঙ্ক, সে-হত্যার প্রেরণা তোমার বংশধারায় নেমে যায়, তারা যদি মানুষের বেদী থেকে চ্যুত হয়ে যায়, আর যদি ভগবানের পায়ে ঠাঁই না পায়?

কমলা এ-কথায় শিহরিত হয়ে কেঁদে উঠলো। মেঝের উপর কপাল রেখে আকুল হয়ে বলতে লাগলো, আমাকে রক্ষা করুন, অসহায় আমি, আমাকে রক্ষা করুন। আমি মেয়ে, হয়তো আমার ভিতর দিয়ে আমারই অন্তরে পুষ্টিলাভ ক'রে শত বর্ষের বংশবিস্তারে এ দেশ হত্যাকারী আর পাপী দিয়ে ছেয়ে যাবে পিতাজী! আমি কি করবো?

ভয় নেই বেটি। হয়তো আমার ভাবনাটাই মিথ্যা, তার সঙ্গে সত্যের নয় কেবল সংস্কারেরই যোগ আছে। তাই আমি ভাবি, গান্ধীবাদ মানুষের বেদী থেকে মানুষকে নামায় না, মানুষকে মহত্তর ক'রে সে-বেদীতে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নানা উপায়ে, কলকারখানা বানিয়ে মানুষকে পশু ক'রে দিয়ে তাকে পুনরুদ্ধার না ক'রে মানুষের অবশিষ্ট মানবত্বকে বড়ো করাই শ্রেয়তর কমলা। তিনি কমলার মাথায় হাত রেখে বললেন, মনে তোমার মালিন্য নেই, অভিমান নেই, তোমার শুভ হোক, বেটি।

কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে যেতেই চোখের জল আর ক্ষণিকের আবেগ কমলাকে লজ্জা দিলে। ভালো ক'রে মুখ ধুয়ে বারান্দায় ব'সে সে গঙ্গার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো। উপর তলাটা তখন নির্জন, চন্দনা নিচে কোথায় গৃহস্থালীতে হারিয়ে গেছে।

বিশ্বকে নিয়ে কমলার ভাবনা। বিশ্বরহস্যকে উদ্‌ঘাটন ক'রে গোচরীভূত করা তার ভাবনার অঙ্গ। কিন্তু তার পিছনে যে বিশ্বনিয়ন্তা আছেন, তাঁর কোনো হাত আছে বিশ্বলীলায়, এ-কথা কমলার কোনোদিন মনে হয়নি। ওই যে সুদূরের সূর্য, ওই যে আরো দূরের আরও বিশাল নক্ষত্রলোক, নীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের তীব্র অনুসন্ধানী বুদ্ধি তাদের অজানা লোক থেকে টেনে নিয়ে এসেছে জানার মহলে। অনুসন্ধান চলেছে অবিরাম অবিশ্রান্ত এদেরই অন্তরের কথাটা জানবার জন্য। সে-বুদ্ধি সূর্যের কোনো নিয়োগকর্তার খবর রাখেনা, মানেনা তার রথ ও সপ্তাশ্বের

কাহিনী। বায়ুতরঙ্গে, শব্দোর্মিতে, আকাশের তারায় মানববুদ্ধির আনাগোনার বিরাম নেই। সব বিষয়ই আজ যা জ্ঞানগত গোচরীভূত নয় কাল তা মানুষের জ্ঞানের অঙ্গ হবে, এ-কথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু আজো যা অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে বিজ্ঞানী কি সেখানে বিশ্বনিয়ন্তার অবস্থিতি মানে? প্রকৃতি এক, বিশ্বনিয়ন্তা অন্য। বিজ্ঞানী আপনার আত্মায় পরমেশ্বরের উপলব্ধি করে যেখানে তর্ক নেই, হিসাব নেই, শুধু সমগ্রতারই উপলব্ধি আছে! কমলা মনে মনে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের নাম স্মরণ করতে লাগলো—যাঁদের মনে বিজ্ঞানসংস্কারের অতীত হয়েও বিশ্বনিয়ন্তার, গড-হেডের প্রভাব প্রকাশমান। নিজের মনেই সে বললে, শুধু শুধু ভগবানের পায়ে ঠাঁই-ছাড়া হবার কথায় উদ্বিগ্ন হতে গেলুম কেন আমি!

কিন্তু ও-কথা বড়ো ভয়ানক—দূষিত রক্তধারা, যা বংশপরম্পরায় নেমে যায়। অর্জিত অবগুণ আগামী বংশ আহরণ করবে উত্তরাধিকারসূত্রে। কতো কি লুকানো আছে, কতো সম্ভাবনার অঙ্কুর আছে, আমার দেহের কোষে কোষে। অ্যাটাভিজম সত্য, বিস্মৃত কালের পূর্ব পুরুষদের ন্যূক্লিয়র য়ুনিয়নের প্রভাবও সত্য। আমার দেহে সে-প্রভাব বর্তমান। প্রতিটি বংশধারা গভীর দাগ রেখে গেছে আমার সমগ্র দেহে। আমি যদি কোনো মানুষের প্রাণহরণ ক'রে থাকি হয়তো আমার স্নায়ুর পথ দিয়ে হত্যার সে উত্তেজনা আমারই ডিম্বকোষের দ্বারা আকার পেয়ে পৃথিবীতে

ছড়িয়ে পড়বে একদিন, খুনী ও বাতুলের বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব হবে আমার। বিবাহ জৈব প্রয়োজন, কমলা ভাবলে, কিন্তু আমার সে-প্রয়োজনের আজ শেষ হয়ে গেলো।

ভবানীশঙ্করের কথা মনে পড়ে গেলো, কম্‌লা, পৃথিবীটা প্রকৃতিতে নির্মম। হত্যা করা প্রাণীমাত্রেরই সহজতম সংস্কার। নানা দেশের ধর্মশাস্ত্রও প্রয়োজন বুঝে হত্যা করাটাকে চরম আদর্শ ব'লে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে, তাই বলছে, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" আবার প্রয়োজন বোধে ধর্মশাস্ত্রই এই পুরনো পোড়-খাওয়া পৃথিবীকে আজও শেখাতে বাধ্য হচ্ছে, "*Love thy neighbour as thyself,*" তার ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। সেবা ভালোবাসা আজও মানুষের সচেতন সতর্ক অভ্যাসের বিষয়, সহজ প্রেরণার নয়। শুধু মুষ্টিমেয় মানুষ ও দুটোর সম্যক উপলব্ধি করতে পারে, প্রত্যেক শতাব্দীতে তারা আর ক'জন! সেবা আর ভালোবাসা সুলভ সহজ নয় ব'লেই আজো সে দুটো আদর্শ হয়েই রয়ে গেলো নির্মমতা হৃদয়হীনতা ও ক্রূরতাভরা এই বিপুল পৃথিবীতে। এক মাতৃগর্ভ থেকে উত্থিত দুটি ভাই পরস্পরের প্রাকৃতিক পরমতম শত্রু, সভ্যতা এই সম্পর্কটার তীক্ষ্ণতাকে কোথাও কোথাও চাপা দিয়েছে মাত্র। এর চেয়ে মানব-প্রকৃতির বিষয়ে সত্যতর ও বড়ো উদাহরণ আর নেই। যাকে তোমরা ন্যাশনলিজম্ বলো সেটা এই আদিম শত্রুতাকে ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সমষ্টিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিশ্বজনীনতার

উপলব্ধি আর ক'জনের! এই ধরো আমি, প্রাতে প্রার্থনা করি, বেদমন্ত্র জপ করি, নীতির নিরিখে পৃথিবীটাকে দেখবার অভিমান রাখি। কিন্তু ন্যাশনলিজ্‌মের ব্যাপক সঙ্কীর্ণতা আমার মনে আছে ষোল আনা। হিংসা দ্বেষ সবই আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রখর হয়ে। চিত্তের উপর পৃষ্ঠে আমি হয়তো সাত্ত্বিক, কিন্তু আমার চিত্তের পরীক্ষা যদি হয় কোনো সঙ্কটকালে, চিত্ততল থেকে কি প্রকাশ হয়ে পড়বে তা আমি ভাবতেও পারিনে। তবু জানি, বিশ্লেষণে নিজেকে পাওয়া যায়না, বিশ্লেষণে সেবা ভালোবাসার উপলব্ধি নেই। সে-উপলব্ধি আছে কেবল সুগভীর বিশ্বাসে, হয়তো বা অন্ধবিশ্বাসে। মনে রেখো, ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।

ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন, কথাটা কমলার বুকে বাজে। তার পথ মেধার, বহুতর শোনার আর বিশ্লেষণের। তার মনে পড়ত, একদিন কয়েকজন চীনা সৈনিক তাদের কালেজ দেখতে এসেছিলো। ছেলেরা তাদের ঘিরে যুদ্ধের কথা শুনছিলো, কমলাও দাঁড়িয়েছিলো অদূরে। একটা সৈনিক তার দেহের নানা ক্ষতের দাগ দেখাচ্ছিলো, তার শেভ্রনের মতোই সে দাগগুলো মূল্যবান। সে লোকটা মেশিন-গনর, হেসে বলছিলো, মেশিন-গনের গুলির মুখে কতো জাপানীকে সে হত্যা করেছে তার আর লেখাজোখা নেই। কমলা তার গর্বিত বর্ণনা শুনে আর থাকতে না পেরে, এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, এতোগুলো মানুষকে হত্যা ক'রে তোমার কোনো অনুশোচনা হয়নি? সৈনিকটা কপট

সম্ভ্রমে বাউ ক'রে মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলো, *My business is to kill, lady !* আমার দেশ জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত, আমি তাদের ভালোবাসতে সমরাঙ্গনে যাইনি।

কমলা ভাবে, এ-যুগে এ-কথা সম্ভব। মানুষ সেটাকে দেশের দোহাই, গণতন্ত্র বা অন্য তন্ত্রের দোহাই, কর্তব্যের দোহাই দিয়ে চিৎকার ক'রে বলে। খৃষ্টীয় ধর্ম ভালোবাসার দয়ার ধর্ম। নীটশে বলেছিলো, *Christ was the only Christian ever born, and he is dead !* সমগ্র মানব ইতিহাসে যীশুর প্রচণ্ড বিফলতার মতো আর বিফলতার কোনো উদাহরণ নেই, তাই সৈনিকটার মুখে ও-কথা সম্ভব, বেশি ক'রেই সম্ভব বোধ হয়। সৈনিকটা ক্রিশ্চান ব'লে আত্মপরিচয় দিয়েছিলো। ভবঘুরে আর সৈনিক বিপরীত প্রান্তের মানুষ। ভবঘুরের চিত্ত তার আপনার, স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত, আপনার লীলায় সে লীলাময়। আর সৈনিক —তার চিত্ত নেই, স্বাধীনতা নেই, তার নিজের বিশ্বাসগত ক্রিয়া নেই। নিগড়ে বাঁধা কাঠের পুতুল সে। সে মারে, সে মারায় সে যে আপনি মরে এমন উপলব্ধি তার নেই তার আত্মা বিশিষ্ট কোনো ধারণার হাড়িকাঠে বলি পড়েছে ব'লে।

কমলাও তো সৈনিক। বিজ্ঞানী নয়, বুদ্ধিদৃপ্ত মানুষ নয়, নিগড়ে বাঁধা কাঠের পুতুল তো সে-ও। বর্তমান কালধর্ম তার নাম রেখেছে পলিটিকল্ মানুষ। ঐতিহ্যের বাঁধা বিশ্বাসের শিকলে বাঁধা ট্রাডিশনল্ মানুষের চেয়েও সে নাকি উচ্চতর, বৃহত্তর, নিজের

স্বভাব-বিবর্তনে আগেকার মানুষের চেয়েও মহত্তর। পলিটিকল্‌ মানুষেরই আত্মস্তুতি এ। কিন্তু বিবর্তন কোথায় তার মনে? বাঁধা কাজ, বাঁধা বুলি, বাঁধা-গৎ-এ সে কোথায় যে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ হয়ে জন্মেছিলো অনেক অনেক দিন আগে?

পিছন থেকে চন্দনা এসে কমলার চোখ টিপে ধ'রে চুড়ির শব্দে ধরা পড়ে বললে, কার কথা ভাবছো কম্‌লা? আহা, আমি যদি পুরুষ হয়ে তোমার ভাবনায় স্থান পেতুম! খাবে চলো এখন, তোমার জন্য আজ মাছ তৈরি ক'রে আনিয়েছি পিতাজীর হুকুমে, অবশ্য আমারই প্যাঁচ-করা হুকুম। আজ প্রথম এ-বাড়িতে মাছ এলো।
ভাবছিলুম আমার অদৃষ্টের কথা, বহন্‌। কিন্তু মাছের জঞ্জাল করতে গেলে কেন? বাড়িতেও আমরা নেহাৎ কালেভদ্রে ওটা খাই।
চন্দনা মনে মনে বললে, আহা। কিন্তু বুঝলেও না যে কমলার অদৃষ্টচিন্তা সমবেদনা প্রকাশের অতীত বিষয়।

অগস্ট বিদ্রোহ তখন নির্বাপিত কিন্তু করাল প্রতিহিংসার আগুন তখনো জ্বলছে লেলিহান শিখা মেলে। সকালবেলা "ভারত" খবর দিয়ে যায়। বালিয়া আবার বৃটিশ রাজত্বে ফিরে এসেছে। চন্দনা সে-সব পড়ে আবার পড়েওনা, কিন্তু কমলা সব কয়টি সংবাদপত্রে সে-খবরগুলি তন্ন তন্ন ক'রে পড়ে। সে দূরবর্তিনী, তবুও তার অন্তরের টান আছে, সে নিজের যোগটাকে নিবিড় ক'রে বোধ করে। শুধু এলাহাবাদে নয়, তার উদ্বিগ্ন মন ছড়িয়ে থাকে বেহার, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই প্রদেশে, এখানে ওখানে। সংবাদ-সংগ্রহ করা তার আগুনের নেশার পরোক্ষ তৃপ্তি। তার চিত্তে দোলা।

কিন্তু এ-অন্তঃপুরে চিত্তদোলাটা ভিন্ন। বর্ষা গান গায়, তার সঙ্গে সমতালে চলে ঝুলনার চিত্তদোলার গান কানুকে ঘিরে। মত্ত বাদল না হ'লে কি ঝুলনা মানায়? এই কালো আকাশ, ঝরঝর ধারা, পরক্ষণেই রৌদ্রস্নাত আকাশে ভেসে বেড়ায় কন্‌হইয়ার প্রতি

সহস্র মিনতি। এই নিশীথ রাত্রি, চাঁদ-ছাওয়া আলোকিত-প্রান্ত মেঘ, চাঁদের হাসির সঙ্গে কানুর আবাহন জেগে ওঠে। মিরজাপুরী যুবতীমন এ-দোলা থামিয়ে রাখতে পারেনা বৃটিশ ভারতে যতো আলোড়নই ঘটে যাকনা কেন।

সেদিনের দোলায় পদ্মা কমলার সঙ্গে বেশি আলাপ করেনি। চন্দনা পরে কমলাকে বলেছিলো, ও যেন এক রকম, আলাপ না হওয়াই ভালো। আর যাই করো, ওর কাছে নিজের পরিচয় দিওনা, ওর অসাধ্য কিছুই নেই। ও-প্রহেলিকাকে বাড়িশুদ্ধ লোক এড়িয়ে চলে। পদ্মা আজো কারো ক্ষতি করেনি, কিন্তু ওর ভেতর যেন ক্ষতির সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

সেদিন পদ্মাই এলো চারতলায়, চন্দনা আর কমলাকে পূর্ণিমা রাতে ঝুলনের নিমন্ত্রণ জানালে। চন্দনা নেচে উঠলো। পদ্মা প্রসন্নমুখে বললে, তোমার বোন কিন্তু কলকাতায় থেকে থেকে কলকত্তাই বঙ্গালী হয়ে গেছে, ওর শাড়ি বদলে দাও। তার নিজের অঙ্গে জরির কাজকরা লেহেঙ্গা, চোলি, স্বচ্ছ ওড়না। বুক আর কোমরের মাঝখানে সুকুমার অনাবৃত দেহ, নিটোল বুকের ইঙ্গিত সেখানেও মাখানো। ওড়নার নিচে বিসর্পিত বেণী। তাকে দেখে কমলার মনে হলো, কোমরের কাছে অনাবৃত ও-অঙ্গটুকু কল্পনা থেকে বাস্তবে ফোটাতে হয়তো ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের শত সহস্র রূপোপাসক প্রাণক্ষয় করেছে। চরম রূপোপলব্ধির জারকে জরানো এ-বেশ।

পদ্মা বললে, কম্‌লাকে তোমার লেহেঙ্গা চোলি পরিয়ে দাও, বহ্নজী।

আমার ও-সব কবে গেছে।

পদ্মা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চন্দনার পানে একটু চেয়ে থেকে বললে, তাহলে তুমি আছো কেন? আমি কম্‌লাকে ও-সব দিতে পারি। পরবে কম্‌লা?

পরবো বৈকি। তোমাকে দেখে ইচ্ছে করছে দু'শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ রমণী হয়ে যেতে। তোমার পোশাক নয়তো, কতো কি-র হাতছানি যেন।

চন্দনার মনটি রসে চটুল, সে কমলার কথা শুনে হাসলো খিলখিল ক'রে। পদ্মা বিন্দুবিসর্গ কিছু না বুঝে যেন কঠিন মুখে বললে, এসো আমার সঙ্গে।

পদ্মার ঘর তেতলায়। আর যাই হোক সেটা বিধবা রমণীর ঘর ব'লে মনে হয়না। শয্যায় যেন বিলাস আলিঙ্গন মাখানো, বালিশ পূর্ণায়তন যুবতীবক্ষের মতো কোমল-কঠিন, স্পর্শবিলাসী। দাঁড়া-দর্পণের দু'পাশে প্রসাধনদ্রব্যের সম্ভার। সুর্মা-পরার রূপোর পাতলা কাঠিটা যেন তখনো পদমার নয়নজলে সিক্ত। উজ্জ্বল আলোয় কমলার দৃষ্টি গেলো সুর্মার কাঠিটা থেকে পদ্মার চোখে। চন্দনার ঘরে তার সে-চোখে দৃষ্টি পড়েনি। কতো কালের অভ্যাস সে সুর্মা টানায়, এক-চুলের তুলি টানার কৌশল তাতে। কমলার মনে পড়ে গেলো লক্ষ্নৌ যাদুঘরের মুঘল যুগের আর্টিস্টের এক-

চুলের তুলিতে আঁকা নূরজহাঁর চোখ। সেই চোখ যেন পদ্মার, কৌশলে আয়ত করা, আয়তন বাড়ানো।

পদ্মা কমলার দিকে চায় ও নানা রঙের লেহেঙ্গা চোলি বার করে। অবশেষে হালকা বেগুনী রঙের পোশাক তার হাতে দিয়ে বললে, তুমি পরতে পারবে, না আমি পরিয়ে দেবো? কটাক্ষে ইঙ্গিতে যেন পদ্মার চোখ জ্বলে উঠলো।

কমলা সঙ্কোচ বোধ ক'রে উত্তর দিলে, না, আমি পরতে জানি। প'রে চন্দনাকে নিয়ে আসছি। সে নিজের ঘরে চলে গেলো।

কে জানে পদমা রূপসী কিনা! কিন্তু সে রতিরূপা, মূর্তিমতী কামনা। সে কালো নয়, স্বচ্ছ আঁধারে উল্লসিত মদালস প্যাশনের মতো, যা দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়না কেবল অল্প কিছু মানুষের গভীর অনুভূতির বস্তু। পদ্মার অনাবৃত কাঁধের বাহুর ত্বক্ আশ্চর্য, বিধাতাই শুধু নির্মাণ করতে পারেন সে ত্বক্, শিল্পী তা এঁকে ধ'রে রাখতে অক্ষম। সে-ত্বকের স্তরেস্তরে সম্পূর্ণতা, তার নিচে কোষে কোষে প্রাণশক্তি। এই ত্বকের অনুকরণ করতে গিয়েই মানুষ বোধকরি সাটিনের সৃষ্টি করতে চেয়েছে, কিন্তু তার বিহ্বল-করা প্যাশনেট স্পর্শের সুখবেদনাটুকুকে একটুও ধরতে পারেনি, সে-স্পর্শ ঋষিরও সংযমহারী। তবুও পদ্মা এখনো যেন অসম্পূর্ণ। কবির ভাষায় তার রূপসজ্জাকে বলা যায়:

"মোতিম হারে বেশ বনালে, সিঁথি লগা লে ভালে।
উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর তোর বাঁধহ চম্পক মালে।"

পদ্মা মোতির মালা গলায় দিয়ে দর্পণের সমুখে খেলা করতে লাগলো। কখনো মালার প্রান্তটা দেয় স্তনের বিভাজন গহ্বরে, কখনো ছড়িয়ে রাখে প্রশস্ত স্তনমূলে।

কমলা ও চন্দনা তার ঘরে এলো। পদ্মা কমলাকে আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। হঠাৎ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, আঃ বাঁচলুম ব'লে। সে চকিতে কমলার উন্মুক্ত পঞ্জরে হাত দিয়ে বললে, এখানে বলি নেই, টোল পড়েনি, কিসের রূপসী তুমি? কমলার দেহ আঁটসাঁট অ্যাথলীটের মতো।

অজস্র ম্যাগনোলিয়ার ফুল বাগানে গন্ধ বিতরণ করছিলো। পদ্মা একটা ফুল ভেঙে নিয়ে নিজের বেণীমূলে গুঁজে দিলে। এ দোলনাটা গঙ্গার ধারে। দিনের আলোর মতো সে-রাত্রে পূর্ণিমার প্রকাশ। গঙ্গার জলচুড়িতে চিকমিক করছে চাঁদের কিরণ। কমলা হঠাৎ ভয়ার্ত শব্দ ক'রে পিছিয়ে এলো। ঘাস জমির উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গোখুরা সাপ নদীর দিকে চলেছে। পদ্মা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, ভয় নেই। আমি আস্তিক-বধূ, সাপের রানী, আমাদের দিকে ওটা আসবেনা। সাপটা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

কমলাকে ঝুলনায় বসিয়ে দড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে চন্দনা ও পদ্মা অভ্যস্থ জানুর শক্তি দিয়ে দোলা দিতে লাগলো। তাদের মুখে গান উঠলো গুনগুনিয়ে--নিঠুর কনহইয়া এক যুবতীর মনিবন্ধ মুচড়ে ধরেছে তাকে পালাতে দেবেনা ব'লে। ক্রীড়াপরায়ণা সে

শাশ্বত যুবতী পদ্মার মুখ দিয়ে গালি দিচ্চে, ক্যয়সে ঢীঠ কন্হইয়া রে হায় !

ভুলতে ভুলতে কমলা যেন কোন শতাব্দীতে চলে গেছে। তার আর পুরুষ সত্তা নেই, যেন সে নারী হয়ে ফিরে গেছে জন্মান্তর হতে জন্মান্তরে আকবর অথবা হর্ষবর্ধন, কনিষ্ক বিম্বিসার বা সমুদ্র-গুপ্তের যুগে। স্বপ্নে সে জন্মান্তর দেখছে—সুদূর বিংশ শতাব্দীতে মিণ্ডর সেনট্রাল কালেজের গবেষণাগার, এডিংটন মেঘনাদ রদরফোর্ড জীন্স ; দেশ গান্ধি নেহ্রু ; তার-কাটা, লরি-জ্বালানো, কোথায় অনির্দিষ্ট ভেসে যাওয়া। গঙ্গা বয়ে চলেছে চিরন্তন ধারায়, বিংশ শতাব্দীতেও সে বয়ে চলবে এই বিহ্বল রাতের উপলব্ধি, মধুর পূর্ণিমার বিস্মৃতি নিয়ে। কমলার আত্মা হয়তো মিশিয়ে যাবে নূতন কোনো অজন্তা বাহরূত অথবা বৃন্দাবনে।

ও কম্‌লা বহন্, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? অনেক রাত হয়েছে চলো। সামনে হাস্যবদনা চন্দন তাকে ডাকছে। কমলার চমক ভাঙলো। একটু দূরে চলেছে আলোছায়ায় মাখানো পদ্মা। তার শ্লথ পদবিক্ষেপে গুরু নিতম্বে আলোছায়ার ঢেউ, তার ওড়না উড়ছে পতাকার মতো।

বালিয়ার পথ বন্ধ, সুতরাং কালেজ না থাকলেও দয়ানন্দ বাড়ি যেতে পারেনি। ছাত্রাবাসেও কেবল দু'চারজন সেই জেলারই ছাত্র। বোধকরি বালিয়াবাসী ব'লেই বিদ্রোহের কালে তার মন নেচেছিলো, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে গিয়ে তাতে যোগ দেবার মতো সাহস তার হয়নি। বর্ষারাতে কমলা এলো তার আশ্রয়ে, দয়ানন্দ নিমেষে বদলালো। অনুক্ষণ সে আপনার মনে বলতে লাগলো, তোমার পাশে দাঁড়াতে পেলে আমি পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে পারি। কবে আসবে সে-সুযোগ!

কালেজে কোয়ডর্যাঙ্গলের ওপার থেকে কমলাকে দেখে দয়ানন্দ গান গাইতো, সে-গানের মানে নেই! কমলার মতো কাউকে দেখলে অনেক ছেলেরই অকারণে জিভ শুড়শুড় ক'রে ওঠে। সে রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠের গানে তাড়ায়, কাছে আনেনা। কিন্তু কে জানতো যে সেই গানেই একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিলো। দয়ানন্দের মনে দাগ লাগলো। যে সব গ্রীক গাণিতিক সমস্যা

নিয়ে সে মাথা ঘামাতো তার সংখ্যাক্ষরে মিলে কমলার দেহের, বিশেষ ক'রে তার মুখের বাহ্যরেখায় পর্যবসিত হলো। অঙ্ক গেলো চুলোয়। একটি দরিদ্র পরিবারের ভরসা গেলো রসাতলে। তার বি-এ পরীক্ষায় পাওয়া সোনার পদকটা দয়ানন্দের মা'র বাক্সের ভিতরেই কলঙ্কে মলিন হতে থাকলো।

আপন মনেই দয়ানন্দ্ নিজের শ্রবণের তৃপ্তির জন্য মৃদুস্বরে ডাকতো, কম্‌লা, কম্‌লাজী। শব্দটা তার কানে মধুবর্ষণ না ক'রে সর্ব দেহে আগুন বর্ষণ করতো। সে ভাবতো সেই রাত্রিটার কথা। সূর্য যেমন অয়নান্তে থেমে যায় একটুখানি, প্রভাত, পরদিন, জাগতিক সব ক্রিয়া যদি তেমনি স্থগিত থাকতো সেই একটি রাত্রির বন্ধনে! যখন কমলাকে তার সাথী একজন যোধপুরী পগড়ি পরিয়ে দিয়েছিলো দয়ানন্দ্ বহু আয়াসে বলবার ইচ্ছাটা রোধ করেছিলো, কম্‌লাজী, চুলগুলো কেটে দি তোমার! বলতে পারেনি। তার মনে হয়েছিলো, ওর বড়ো ক্ষতি, ওর বড়ো ধ্বংস আর নেই। এক শৌখিন অধ্যাপক তার ঘড়িতে না-জানি কার চুলের ফব্-চেন লাগিয়ে দয়ানন্দের ক্লাশে আসতো। সে-কল্পনায় অনুভব করতো তার গলার কুস্তিগীরের ভৈঁরোনাথ মহাদেবের মালাটা কমলার কুন্তলেরই সূক্ষ্ম বিনুনি করা। তার হর্ষ হতো যখন মনে পড়ে যেতো যে তার কানের কুণ্ডল কমলার কোমল কর্ণপটাহে বিরাজ করছে। ঠাকুরবংশের টিকা লেগে আছে বাঙালিনীর দেহে।

দেখে আসি ? চিঠি লিখি ? না, চিঠি লেখার দায়িত্ব বিপদ অনেক। সতীশকে সে ঈর্ষা করতে লাগলো। একদিন সে সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে গেলো। বিলুর দৌত্যে দেখা পেয়ে বললে, মাতাজী, কম্‌লাজীর খবর আপনাকে দিতে এলুম। তিনি আছেন মিরজাপুরে আমাদেরই এক কালেজ সঙ্গীর বাড়িতে।

সুজাতা চুপ ক'রে শুনলেন। দয়ানন্দ্‌ জানতো না, ইতিমধ্যে অনেক ব্যক্তি তাঁকে কমলার খবর দিতে এসেছে, সহানুভূতি প্রকাশ করেছে কতো প্রকারে। কিন্তু তারা নিজেদের কৌতূহল সুজাতার কাছে গোপন করতে পারেনি। তারা ছাত্রবেশী, কিন্তু প্রকাশ ক'রে গেছে যে তারা সি আই ডি'র অন্নে পুষ্ট।

সুজাতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা দিতেই দয়ানন্দ্‌ গ্রেপ্তার হলো। তার প্রথম দিনটা কাটলো কোতওয়ালীর অন্ধকার কয়েদখানায়। ভীরু বুক, দয়ানন্দের বুক কাঁপলো। কিন্তু বিনিদ্র রাত্রে কমলার মুখ তাকে সাহস দিয়ে গেলো। সহস্র প্যাঁচোয়া প্রশ্নের উত্তরে দয়ানন্দ্‌ একই জবাব দিলে, গরীব ছাত্র আমি, জলপানির সাহায্যে লেখাপড়া করি। অ্যাস্ট্রনমির বই ধার দিয়েছিলুম কম্‌লা মিত্তিরকে। প্রয়োজনের তাগাদায় আমি সেই বইটার খোঁজে গিয়েছিলুম।

পাঁচ দিন বাদে কিছু লাঞ্ছনার পর দয়ানন্দের মুক্তি হলো তার শুভাদৃষ্টের জোরে। কোতওয়ালী থেকে সে জেনে এলো কমলার গ্রেপ্তারী পুরস্কারের অঙ্কটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কয়েদ আর

লাঞ্ছনার কারণে তার মনে হলো, কমলা আরো কাছে এসেছে তার, তার আরো অখণ্ড অধিকার জন্মেছে কমলার উপর। কোন বা কতোটুকু ইঙ্গিতে যুবমনের নূতন পরত বিকশিত হয়ে ওঠে কে জানে! দয়ানন্দের পিপাসা প্রখর হয়ে উঠলো। বাঙালিনী যদি অসংখ্য পঞ্জাবী সিন্ধির ঘরনী হতে পারে, বালিয়ার ঠাকুরাইনই বা হবে না কেন? নূতন রস পাবে তাহলে বালিয়ার শুকনো মাটি।

কেন যে কমলা এক লহমার জন্য দয়ানন্দের কাছে এলো! আগে তার নারীচিন্তা ছিলো না, ছিলো বড়ো হবার কঠিন পণ তার নিজের অসাধারণ ধীশক্তি দিয়ে। সে অতি ক্ষুদ্র জমিদার, বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে চাষীর ছেলে। তার উপর ন্যস্ত পুরুষানুক্রমের কতো শতাব্দীর, চাষীর দুর্ভাগ্য অতিক্রম ক'রে আরো কিছু হবার ভার, সেই সমাজমণ্ডলে যাবার যেখানে কদন্ন নেই, আকাশের কাছে নিজের ভাগ্যকে সমর্পণ করা নেই, দেনার পীড়া নেই, নেই মহাজনের অত্যাচার। দয়ানন্দ এ-সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলো। দেশ তার আত্মার তন্তুগুলিতে টান দিতো, কিন্তু সে নিজেকে বোঝাতো, আমি বড়ো হলে দেশও বড়ো হবে। আমি শক্তি পেলে সে-শক্তি আমার দ্বারা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হবে।

কিন্তু কমলার কাছে যেতে গেলে দেশ ছাড়া পথ নেই। কমলা তাকে দেশের কথা বেশি ক'রে ভাবায়, কমলাই তার দেশ।

পৃথিবীতে রমণী যদি না থাকতো পৃথিবীটা তাহলে কেমন

হয়তো কে জানে! আর যাই হোক, তাহলে মানুষ ঈডেন উদ্যান থেকে দুঃখ কুড়িয়ে আনতো না; রামায়ণ রচিত হতো না, মহাভারতও নয়। দয়ানন্দ কবিপ্রাণ নয়, কাব্যের ক্ষতির কথাটা ভাবেনা। কিন্তু কবি নয়ই বা কেন? ভালো যদি সে বেসে থাকে তাহলে সে দেশরূপিণী কমলাকে ভালোবেসেছিলো, রক্তমাংসে গড়া সুন্দরী মেয়েটিকে নয়। কমলা আগুনের ফুলকি না হয়ে শুধু বধু হবার মতো মেয়ে হলে দয়ানন্দের মন তার কাছেও আসতো না।

সে কবে একদিন এক কবি-সম্মেলনে গিয়েছিলো। তার কানে এক কবির আবৃত্তি বিনা প্রয়াসে বন্দী হয়েছিলো। সেই কবির ভাষা মনে পড়ে যায়—

"নহি যাতি কিসী কি য়াদ
প্রাণোঁ সে নহি যাতি।
কিসী কি মদভরি চিৎবন
কলেজে সে নহি যাতি।"

জগতটা যদি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো! তার যদি আয়ত্তে থাকতো বসন্তকাল আর ফুল বনের অদৃষ্ট, যদি যৌবন সমারোহ দয়ানন্দের হুকুম মানতো, তাহলে, তাহলে—দয়ানন্দ ভাবতো,

"মেরা বশ চলতা ময়
বন যাতা সন্তার তুমহারা।"

পূর্বদিনে কমলাকে জ্বালাবার জন্য সে সতীনের গান গাইতো ফিজিক্স ল্যাবরেটরিটাকে সতীনের ঘর মনে করে। রস উথলে উঠলে কমলাকে দূর থেকে শোনাতো, এয়সে বেদর্দীকে পালে পড়া হুঁ। সে-সব গান দয়ানন্দের জিভ থেকে মুছে গেলো। অঙ্কশাস্ত্র ছাপিয়ে তার অন্তর খালি গাইতো, যাদু আঁখোঁ কি লড়ি। সেই রাত্রের বারবার আঁখির মিলনের গান।

মশগুল নারীচিন্তার মাঝে দয়ানন্দ হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে নিজেকে বলে, আরে ও চাষার বেটা, তোর এ *dallying in Delilah's garden* কেন? কম্‌লাই যদি তোর দেশের প্রতিমা, তার কাছে যাবার জন্য তো খোলা পথ পড়ে রয়েছে!

সে উপরতলায় ল' ক্লাশের একটি ছেলের ঘরে গেলো। সেও বালিয়া জেলার লোক! ছেলেটি নিজেকে কম্যুনিষ্ট ব'লে প্রচার করতো। দয়ানন্দ বললে, আমাকে লেনিনের, ওয়েবদম্পতীর রচনা দাও। সে জানতো না যে ছেলেটির লালধ্বজার পূজাটাই সার, লেখাপড়ার বালাই নেই। সে চক্ষু কপালে তুলে বললে, ওসব আমার নেই, কস্মিনকালেও ছিলো না; ওয়েবদের বই কে কিনবে? অসম্ভব দাম।

দয়ানন্দ তার কাছ থেকে টেনেন্সি অ্যাক্ট নিয়ে এলো। সারা রাত্রি ধ'রে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলো, চাষীর প্রকৃত অবস্থা কি, তার সঙ্গে জমির মালিকের যোগসূত্রটা কতোখানি আশ্বাস নিরাপত্তা নির্ভরতার আর কতোটা শোষণের ডোরা দিয়ে গড়া।

তার চোখে টেনেন্সি অ্যাক্ট ও কমলা মিত্তির এক হয়ে গেলো। ওরা যদি এক হয়, তাহলে চাষার ক্ষুধা, চাষীর পীড়নের বেদীতে দাঁড়িয়েই এক হতে পারবে, আর কিছু দিয়ে নয়।

পথ খুঁজে নিয়ে দয়ানন্দ ভাবলে, যাই কমলাকে ব'লে আসি, তোমার পথেই আমি নেমে এলুম। যে-পথের শেষে তুমি আছো, যে-পথ সাধনায় কামনায় অতিক্রম করতে পারলে তোমার কাছে পৌছতে পারবো। তুমিও হয়তো সে-পথে আমার দিকে এগিয়ে আসবে একদিন।

ব্রজবিহারীকে দেখে চন্দনার মুখ গম্ভীর হলো। ব্রজবিহারী সতীশের বড়ো ভাই, তার স্বামী। এতোকাল সে বোম্বাই আর কলকাতা ক'রে বেড়াচ্ছিলো। ব্রজবিহারী বড়ো ব্যবসায়ী, তার চিনির কল, গালিচা-বোনার কারখানা, পাথরের ব্যবসা, আরো অনেক কিছুতে সে লিপ্ত। তার আরাধনা ক্রোড় অঙ্কের টাকার, যদ্ধ তাকে বিপুলভাবে অজস্র অর্থ উপার্জনের সুযোগ দিয়েছে। মিরজাপুরে থাকলে সে এ-বাড়িতে থাকে না, থাকে গঙ্গার ধারে নিজের বাগান-বাড়িতে। বাড়িতে আসতে হলে চন্দনাকে খবর পাঠায়। তাই চন্দনার ঘরে ব্রজবিহারীর কোনো ছাপ নেই, সে ঘরে কোনো পুরুষালি আবহাওয়া নেই। এটা কমলা গোড়াতেই লক্ষ্য করেছিলো, কিন্তু চন্দনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ সখীত্বে পরিণত হলেও কোনোদিন সে প্রশ্ন করেনি, তার ঘরে বিবাহের রঙ নেই কেন, সে-ঘরে এলে আর একটি ব্যক্তিত্বের অনুভূতি হয় না কেন। এবার খবর না দিয়েই এলো স্বামী। চন্দনা তার কারণ বুঝলে।

বাঘ নাক উঁচু ক'রে আঘ্রাণ নেয় বনের কোন দিকে হরিণ আছে, তারপর সেই দিকে যায় মৃগয়ায়। বৃজবিহারী যেখানেই থাক কমলার ঘ্রাণ সে পাবেই, এ-কথা চন্দনা জানতো। সতীশও জানতো এ-কথা, তাই চন্দনাকে সে প্রথম দিনেই ইঙ্গিত করেছিলো। স্বামীর সঙ্গে কুশল আদানপ্রদানের সময়েই চন্দনা ভেবে নিলে। এইবার প্রশ্ন আসবে কমলার বিষয়ে। তার মনে হঠাৎ কথা জাগলো, ও মেয়ের কাছে এই ইন্দ্রিয়বিলাসী ধনগর্বী তুচ্ছ মানুষটার মূল্য কতোটুকু! চন্দনা মুচকে হাসলো ভেবে, তোমার এ-অনুসরণ করা নিরাপদ নয়।

বৃজবিহারী জিজ্ঞাসা করলে, হাসলে যে চন্দন?

ও এমনি নিরর্থক হাসি, যা সব মেয়েই বিশেষ বিশেষ ক্ষণে হেসে থাকে।

বৃজবিহারী চন্দনার তীক্ষ্ণধার বাঁকা ভাষার সঙ্গে পরিচয় রাখতো। সেদিকে না গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ তোমার কোন বোন? আমি দেখেছি ব'লে মনে করতে পারছি না তো!

সেটা তোমার সৌভাগ্য। স্ত্রীর সব ভগ্নিগুলিকে আগে থেকে চিনে রাখলে রস অব্যাহত থাকে না, স্ত্রীর প্রতি টানেও উত্তানভাব থাকে না। প্রত্যেক স্বামীর উচিৎ প্রতি চার বছর অন্তর স্ত্রীর অন্য ভগ্নিদের একটি একটি ক'রে দেখা। দুজনেই ওরা হাসলো। কম্‌লা আমার মৌসেরা বোন, নিজের মাসি না হলেও খুব কাছের সম্পর্কের মাসির মেয়ে। আলাপ করবে? বসো, ডেকে আনি।

বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে ব'সে কমলা পড়ছিলো। হাতে ফ্রয়েডের বই, পড়ছিলো *Civilisation and Discontent*— সভ্যতা ও অশান্তি। তার চেতনা আবদ্ধ হয়েছিলো বাক্যটায়— মানুষের দেহে, আবেষ্টনে, সামাজিক সম্বন্ধে অশান্তির অসংখ্য বীজ ছড়ানো। শেষ ছুটো থেকে মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে, কিন্তু দেহস্থিত বীজের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি নেই তার। পড়ছিলো আর কমলা ভাবছিলো, কবে মানুষ এ পলায়নপরতা, সন্ন্যাস রোগ থেকে মুক্তি পাবে ? সন্ন্যাসের চেয়েও মানুষ জীবনদর্শনের আশ্রয় নেবে কবে, যাতে তর্কের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের চেয়ে, ন্যায়ের চেয়ে বিবেচনার মধুর মৃদুতা বড়ো, হাসি বড়ো।

চন্দনা এসে তার হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে বল্‌লে, ভাবনা থামাও বহন্। দুয়ারে তোমার ব্রজবিহারী। কালেজে পড়ে ভেবে রেখেছো বৃন্দাবন নেই, কদম্ব নেই, মুরলীর তান নেই—

কমলা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো, তোমার কি হলো ভাই ? সকালবেলাতেই পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

চন্দনা তাকে ক্ষণিকের জন্য দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে বললে, তা নয়, আমার স্বামী এসেছেন আমার ঘরে ! কমলাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে আবার বললে, দেখতে চাইছেন তোমাকে। বৃজবিহারী নাম কিনা, তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিলুম যে বৃন্দাবন অমর, বৃন্দাবনের সম্ভাবনা অমর।

কমলার মুখ লাল হয়ে গেলো। মেয়েলি সংস্কারবশে আরশিতে সে চকিত নয়নে নিজেকে দেখে নিলে। ওরা তখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। চন্দনা তা লক্ষ্য ক'রে আবার হাসলো, বললে, বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে কম্‌লা। মুখে বরং একটু কালির পোঁছ দিয়ে নাও। চুল নাও বেঁধে। ও বাঙালী-চুল দেখলে কারো জ্ঞান থাকে না। সিন্ধু থেকে কাভেরী পর্যন্ত মানুষ উন্মাদ ও-চুলের স্তুতিতে। যদি ঘোমটা দিতে! না না, ঘোমটা নয়, তাতে তোমার মারাত্মকতা আরো বেড়ে যাবে। শুধু আমি একদিন তোমার ঘোমটা দিয়ে আগুন ঢাকা দেখবো।

কমলার কানে এলো 'নমস্তে' কথাটা। চকিতে মনে হলো, কতো না অশান্তির বীজ সুপ্ত আছে আমাদের সামাজিক সম্বন্ধে!

বৃজবিহারীর বিস্ফারিত চোখ জ্বলছিলো কিন্তু বিনম্রস্বরে সে দু-একটা কথার পর বললে, স্ত্রীর এমন প্রতিমাস্বরূপিণী ভগ্নিকে অমনি দেখতে নেই। আমার এ-উপহার যেন আপনার আশ্রয় পায়। সে পকেট থেকে দুটো হীরায়-নীলায় গাঁথা হার বার করলে। নীলা শুভাদৃষ্টে সিঁধকাটা মণি। চন্দনাকে একটা দিয়ে বললে, এটা তোমার চন্দন। অন্যটা তার প্রসারিত হাতে গ্রহণের অপেক্ষায় কমলার বুকের সামনে দুলতে লাগলো।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে কমলা বললে, আমি তো অলঙ্কার পরিনে জী। তাও এতো দামী অলঙ্কার। এ অপরিচিতাকে দিয়ে কেবল টাকা নষ্ট করা।

নিন আপনি, কতোটুকুই বা দাম! বাঙলা দেশের চাল আমি অন্যত্র বেচে সদ্য সদ্য বারো লাখ টাকা ঘরে এনেছি, কম্‌লাজী। পঁচিশ হাজার আপনার অর্ঘ্যের উপযুক্তই নয়। টাকার চালে দম বন্ধ করা চোখ ধাঁধানো ব্রজবিহারীর ভালো ক'রেই জানা ছিলো। সে জানতো, একটা বিশিষ্ট সীমানার পারে অর্থের আকর্ষণ সাধারণ মানুষের নৈতিক শক্তিটুকুকে নুইয়ে দেয়।

চন্দনা ইঙ্গিত করলে কথা না বাড়াতে। হারটা কমলা হাত পেতে নিলে। ব্রজবিহারীর মুখে বুঝি বা জয়ের আনন্দ ফুটে উঠলো। সে মৃদু হেসে চলে যেতেই চন্দনা বললে, এখন ওটা গঙ্গায় ফেলে দিতে পারো। আমি যদি তা পারতুম! তার মুখ দেখে কমলা বিস্মিত হলো।

দুপুরবেলা কমলার নামে একটা চিঠি ও একটা গালিচা এলো। গালিচাটার পরিচয়লিপিতে এক্স্‌-লা শ্যাপেলের এক শতাব্দী আগের এক গুনরী শিল্পীর নাম। গালিচাটা বহুমূল্য, তার বাসন্তী জমি বিচিত্র নীল ছকের পাড় দিয়ে বাঁধা। চিঠিতে লেখা, আপনার চরণ দিয়ে প্রতি পাদবিক্ষেপে রাঙা পদ্ম আঁকবেন এর উপর।

চন্দনা কাছে দাঁড়িয়েছিলো, মৃচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, গালিচাটা পাতবে না কম্‌লা?

গালিচা অত্যন্ত ভালো জিনিস, বহন্‌, কিন্তু মাটি থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে আলাদা ক'রে দেয়। মানুষ ভাবে আমি মাটি

থেকে বিচ্যুত হয়ে উঁচু হলুম, বড়ো হলুম। কিন্তু যা সত্যিকারের মহান তা মাটিতেই যুক্ত। এই দেখো গঙ্গা, মাটির বুকের ধারা। ওই দেখো বিন্ধ্যগিরি, মাটিরই আক্ষেপ। আমাদের কবিকে জানো তো? তাঁরও আশ্রয় ছিলো মাটি, তাঁর "শ্যামলীর" মাটি তাঁকে ঘিরে থাকতো। গান্ধিজীও মাটির কাছের মানুষ। চন্দন বহিন, তুমিই আমাকে চারতলায় তুলে মাটি ছাড়া করেছো।

চন্দনা কমলার ফিলসফি বুঝলো না কিন্তু তার প্রত্যাখ্যান করার সুরুচিটা বুঝলো।

ভবানীশঙ্কর কোনোদিন দুপুরবেলা কমলাকে ডাকেননি, সেদিন ডেকে পাঠালেন। সে গিয়ে বসতেই তার দু'হাতে কাশের ফুল ও ধানের শীষ ভ'রে দিলেন। মৃদু হাসলেন, তোমাকে দিলুম ব'লে। বাঙালীরা লক্ষ্মীপূজা করে, আমিও আজ কমলার আবাহন করলুম।

কমলা নত মাথা আরো নত করলে।

হঠাৎ তার কানে প্রশ্ন এলো, তোমার আত্মশক্তি কতোটুকু মেয়ে?

জানিনে তো পিতাজী। কমলা হাসলো একটু।

ভবানীশঙ্কর একটু অপেক্ষা ক'রে তাকিয়ার তলা থেকে অতি ক্ষুদ্র রুপালী একটা পিস্তল বার ক'রে কমলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে

বললেন, এটা কাছে রাখো কম্‌লা। এমন বন্ধু আর নেই। আমার চেয়ে ওটার সহায় নির্ভরতা অনেক বেশি।

কমলা চমকে উঠলো, পরক্ষণেই তার মুখ পাঙাশ হয়ে গেলো ভবানীশঙ্করের কথার নিহিত অর্থটা মনে ক'রে। এ কি লজ্জা, এ কি বিড়ম্বনা! মাথা আরো নিচু ক'রে মৃদু স্বরে সে বললে, আপনার আশীর্বাদ পেয়েছি পিতাজী, ওটার আর দরকার হবে না।

অস্ত্রটাকে আবার বালিশের তলায় রেখে তিনি বললেন, তোমার কথা সত্য। ভুলে গিয়েছিলুম তুমি পথে বেরিয়েছো নিজের হাত দুটিকে ভরসা ক'রে, ভগবান তোমার হাতে অস্ত্র দিয়েই রেখেছেন। ভবানীশঙ্কর চোখ বুজলেন।

ব্রজবিহারী তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিলো। কিন্তু বারো লাখ বা আরো লাখ টাকার কলুষিত গর্ব তাঁর কাছে ক'রে যাবার সাহস পায়নি। ছেলে চলে যেতেই হঠাৎ তাঁর নিজের হাতের আংটিটার ওপর দৃষ্টি পড়লো। হীরাটার সবগুলি পলে একসঙ্গে দৃষ্টি পড়ে না, যেটায় পড়ে সেইটাই শুধু জ্বলে ওঠে, সেটাই বেশি ক'রে দেখা যায়। আংটিতে কমলার মুখের যেন ছবি ফুটে উঠলো।

আমি দেখছি তোমাকে নবাগত আশ্চর্য পলিটিকল মানুষ, ভবানীশঙ্কর ভাবতে লাগলেন। তোমার অন্য পলগুলি আমি আজো দেখলুম না, হয়তো দেখতে পাবো না কোনোদিন। কিন্তু প্রত্যেক দর্শক তোমাকে বিভিন্ন ক'রে দেখবে। আর ব্রজবিহারী

দেখবে তুমি লালসার, লোভের বস্তু, তুমি মোহ ছড়াতে পারো, তার সকল ইন্দ্রিয়কে উন্মাদ ক'রে দিতে পারো। তোমার পল-গুলো তোমার প্রকৃত রূপকে মিথ্যা আবরণে ঢেকে রেখেছে।

সেইক্ষণে ভবানীশঙ্কর কাশগুচ্ছ ও ধানের শীর্ষ আনিয়ে, অস্ত্রটাকে পরীক্ষা ক'রে রেখে কমলাকে ডাক দিয়েছিলেন।

তিনি চোখ খুলে দেখলেন কমলা তখনো বসে আছে, বললেন, ভালোই হলো, এখনো বসে আছো। মনে হচ্ছিলো তুমি চলে গেছো। দেখো বেটি, ইংরাজের প্রচণ্ড শক্তির এক কোণে তুমি হয়তো আগুন লাগিয়ে দিতে পারো, কিন্তু ঘৃণ্য যা, নীচাশয় যা তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার শক্তি পাওয়া সহজ কথা নয়। তুমি কি ক'রে দিন কাটাচ্ছো জানিনে, কিন্তু এখানে এসে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছো। নিষ্ক্রিয়তা তোমার অভিশাপ।

সে কথা সত্য পিতাজী, দিন আমার কাটতে চায় না।

বোধ করি তোমার পলাতক জীবনে নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে এড়ানো যাবে না। আচ্ছা, তোমাকে পরে বলবো কি করতে পারো তুমি।

কমলা কাশের গুচ্ছ ও ধানের শীষগুলি নিয়ে চলে গেলো। খুঁজে পেতে একটা আধারে সেগুলো সাজাতে সাজাতে ভাবলে, ফুল সাজানো এক, এ যেন গম্ভীরতর শুদ্ধতর অন্য নিসর্গকে ঘরে আনা। ফুলে আছে বিলাস আবেশ, কাশের গোছায় নিষ্ঠার নম্রতা, ধানের শীষে আশ্বাসের মাধুর্য। হঠাৎ তার পর্দার উপর

নজর পড়লো, তলার ফাঁক দিয়ে সতীশের পা দেখা যাচ্ছে। ডাক দিলে, এসো সতীশ।

পাপোশের উপর দাঁড়িয়ে সতীশ হাসলো, বললে, আসতে ভয় করছিলো, তবুও আসতে হলো। একটা কথা চট ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে যাই, যাবেন আর কোথাও? আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। সতীশের মুখের উদ্বেগ হাসি-ছাপানো।

কমলা বুঝলো, উত্তর দিলে, না সতীশ, তোমার ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

এই উত্তরই আমি আশা করছিলুম, কম্‌লাজী। তবুও দরকার হলে যেন দোতলায় আপনার সাড়া পৌছয়। এতো বড়ো বাড়িতে মানুষ থাকে কেন বুঝতে পারিনে। কিন্তু পরশু তো কালেজ খুলছে, চলে যাচ্ছি। সাড়া দেবেনই বা কাকে!

খুলছে নাকি? চন্দনাকে কালেজের খবর দিও। আর একটা কাজ ক'রো, পারো যদি এটা আমার মা'র হাতে পৌছে দিও, চিঠি দিতে পারবো না তো! কমলা এক গাছি চুড়ি খুলে সতীশের হাতে দিলে।

চন্দনা সংসারে খাটে, খবরদারি করে, পদ্‌মা থাকে নিজেকে নিয়ে। তাকে কেউ কিছুতে ডাকে না, সে সাড়াও দেয় না কোনো ডাকে। সংসার থেকে তার মাসহারা বাঁধা, কাজেই তার অর্থের অভাব নেই, আবার চন্দনার কাছে সে ধারও করে অজস্র। চন্দনার

মাসহারার অধিকাংশ যায় সতীশ আর পদ্মাকে পুষতে, যদিও সতীশের দাবীটাই কম।

পদ্মার কাজ নিজেকে সাজানো; নিজেকে দেখা। আর ভাবা তার দেহ দিয়ে সে বিশ্বসংসারকে জয় করতে পারে। নিরন্তর কল্পনায় সে পরিচিত অপরিচিত নানা পুরুষকে জয় করে। তার কল্পনার রঙ্গমঞ্চে সে এক এক জনকে ডেকে আনে, তন্ময় হয়ে কল্পিত কেলির দ্বারা পদ্মা তাকে ধাপে ধাপে, তিল তিল ক'রে আয়ত্ত করে। এই বিভোর চিন্তায় তার দিন কাটে রাত কাটে। তার চিন্তার পটে নিত্য নূতন মানুষ তাই। চন্দনা শুধুই জানে পদ্মা নিজেকে সাজায় আর চোখ নিমীলিত ক'রে কি ভাবে। কিন্তু এ-কথা সে জানেনা পদ্মার চিন্তা লক্ষ্যশূন্য নয়, তার এ বিজয়বিলাস পরম আশ্চর্যের। তার এ-আত্মরতির প্রকাশ আছে তার রোমাঞ্চে শীৎকারে! পদ্মা আপনাতেই মুগ্ধ, আপনাতেই আবদ্ধ। নিজের ঘরের বাইরে তার অভিসার নেই, শুধু মানস অভিসার তার বহুদূর ব্যাপী।

কমলা কিন্তু তার এ অক্লান্ত চিন্তায় বাধা ঘটিয়েছিলো। প্রথম দিন থেকে তাকে দেখেই পদ্মার দেহে জ্বালা ধরলো। যতোই সে কমলাকে দেখতো পদ্মা ততোই জ্বলে উঠতো তার বিশ্বে প্রতিযোগী এলো ব'লে। পদ্মার মন বলতো, হেরে গেছো পদ্মা, তুমি কমলার পাদনখরের তুল্যও নও। এ-চিন্তায় তার জ্বালা বাড়তো; নিজের কাছেই সে পরাজয়ের প্রতিবাদ করতো।

কল্পনায় কমলার প্রতি অঙ্গের সঙ্গে নিজের প্রতি অঙ্গের তুলনা ক'রে সে জয়ের উল্লাসের কারণ আবিষ্কার করতো নিজে নিজেই। পদ্মা জানতো চোলি-ওড়নার আবরণে তার আকর্ষণ মারাত্মক। তার অভিমান ছিলো সে যেন চন্দ্রসূর্যকে ছারখার ক'রে দিতে পারে চোলি-ওড়না, তার সঙ্গত প্রসাধন দিয়ে। তাই সে-রাত্রে সে কমলাকে তার বলের ক্ষেত্রে চোলি-ওড়নার প্রতিযোগিতায় দাঁড় করালো ; হারালো বিষম ক'রে। প্রসন্ন হলো। কমলার দুর্গতির জন্য তার প্রতি অনুকম্পাও বোধ করলে, তার রূপের রানীত্বে কমলা কোনো দাগ দিতে পারলে না ভেবে। কিন্তু তবুও সহজের ক্ষেত্রে পদ্মার দ্বিধা গেলো না, সে বড়ো, না, কমলা বড়ো।

সন্ধ্যায় কমলা পদ্মার ঘরে নেমে গেলো। স্তিমিত আলোয় ফুলদানীর গন্ধরাজ ফুলগুলো তীব্র মাদক গন্ধ বিস্তার করছে। পালঙ্কে ঠেস দিয়ে পুরোবাহুতে চোখ ঢাকা রেখে পদ্মা তখন অভিসারে বেরিয়েছে। সে কমলার সাড়ায় জাগলো। অন্য একটা উজ্জ্বল আলো জ্বেলে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে পদ্মা কমলার দিকে চেয়ে রইলো।

কমলা হারটা বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি তোমার? সিঁড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি। চন্দন বললে তার নয়, ওরটাও দেখলুম এইটারই মতো।

পদ্মার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো, বললে, আমারই বটে। চন্দনার ঘরে যেতে কখন খুলে পড়ে গেছে, লক্ষ্য করিনি।

কমলা পদ্মার স্থির দৃষ্টির সামনে বালিশের উপর হারটাকে মেলিয়ে রাখলে। মুখে বললে, না জানি তোমাকে এ-কণ্ঠহারে কেমন দেখায়।

পদ্মা হঠাৎ অতি মাত্রায় প্রসন্ন হয়ে তাকে পান দিয়ে গল্প করতে লাগলো। কমলার সঙ্গে গল্প করা এই তার প্রথম।

ওঠবার সময়ে কমলা জিজ্ঞাসা করলে, একটা গালিচা নেবে পদ্মা বহন্? চন্দন আমাকে দিয়েছে। আমার দরকার নেই। ও-গালিচা সামঞ্জস্যের অভাবে আমাদের ঘরে মানাবেও না।

সেই রাত্রেই গালিচাটা পদ্মার ঘরে এলো।

চন্দনাকে কমলা এ-দাতব্যের কথাটা জানালে। চন্দনা বললে, ভালোই হলো, ও-দুটো উপযুক্ত আবর্জনার স্তূপে গেলো। গঙ্গায় ফেলে দিলে পাপহারিণী গঙ্গারও কলুষের বোঝা বাড়তো।

চারতলার ছাতে পদ্মা সে-রাত্রে নীহারিকা-পুঞ্জের সঙ্গে নিজের মণিহারের দ্বন্দ্ব জাগিয়ে রাখলে।

পূজা করবার ক্ষুধাটা মানুষের অসীম অতৃপ্ত, তাই তার দেবদেবীর সংখ্যা নেই। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি, গ্রীক প্যান্থিয়নে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের দেবতা। ধ্যানী বুদ্ধ একটি, কিন্তু মুদ্রায় প্রকাশে বিভিন্ন। শিবের নানা প্রকাশও বিভিন্ন পরিচয়ের মন্দিরে বন্দী। এ-কালটা ভিন্ন, পুরনো দেবতাদের প্রতাপ এ-কালে নিঃশেষিত-প্রায়। সতীশের মনে কতো মন্দির কে জানে, কিন্তু সে মন্দিরগুলিতে দেবীর সমারোহ। কালের নূতন যুবক-মনের প্যান্থিয়নে তাই গ্রেটা গার্বো, ক্লদেৎ কোলবেয়র, কাননবালা, লীলা দেশাই, আরো কতো কে।

সতীশ মাত্র উনিশে পা দিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে কয়েক মাস। এর আগে সে ছিলো বালক। একদা কয়েক ঘণ্টায় তার বালকত্বের অবসান ঘটলো। দলের সঙ্গে সেও সিনেমা গেলো 'মাতাহারি' দেখতে। গ্যামেলানের প্যাশনেট বাজনায় সতীশের নেশা ধরলো, তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো নূতন সম্ভাবনার

আশায় এবং সে-সম্ভাবনা প্রকটিত হলো হৃদয়াবেগের বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে। কে জানে ছবিটার সে ছোকরা রাশিয়ন অফিসারটার কি নাম, ভেরোনফ না সাব্যুরভ! সে যখন মাতাহারিকে কোলে তুলে নিয়ে গেলো সতীশের দৃষ্টি পড়লো মাতাহারির নাসায়, তার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, প্রশ্বাস সঘন। প্যাশনের সে ঘন বিপুল আবেশ সতীশের অভিজ্ঞতার অতীত, কিন্তু তার স্নায়ুজালে সে বিস্ফারিত নাসা, সঘন প্রশ্বাস প্রলয় ঘটিয়ে গেলো। সেই নিমেষের প্রলয়ে সতীশের মনে হলো তার সমগ্র দেহ সূর্যের মতো তাপমণ্ডল হয়ে গেছে। তারপর যুগপৎ এলো তার দেহে যেন হিমালয়সম্ভব শৈত্য। পলের পরিধিতে তার দেহে শীতাতপ ক্রমাগত পরিক্রমণ করছে।

সে পরের দৃশ্যটা দেখলে, প্যাশন অবসানের ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দুটি সিগারেটের আগুনের পাশাপাশি গায়ে-গা-দেওয়া দ্যুতি। আর সে দীপ্তির মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মাতাহারি নামধারিণী গার্বোর ভারী-গলাব ঘুম-জড়ানো মদালস মদির মৃদু-স্বর। আবার সতীশের অন্তরে বাহিরে শীতাতপ তীব্র আবর্তনে মেতে গেলো। তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবার মতো তীক্ষ্ণ এক অবর্ণনীয় বেদনায় একটি মাত্র ক্ষুদ্র স্থানে উদ্বেল হয়ে উঠলো। তার মনে হলো তার হৃদপিণ্ডটা ও সকল শিরাধমনী ফুলে উঠেছে, একটা অনির্দিষ্ট বিজলীর শক্তির দ্বারা তারা ক্ষুব্ধ মাতাল। ঝড় উঠেছে, প্রলয় জেগেছে তার মস্তিষ্কে, তার আত্মায়, তার সমগ্র সত্তায়।

সেই বিস্ফারিত নাসা আর নিবিড় আঁধারে আগুনের দুটি বিন্দু সতীশকে বারবার টানলো, সে আরো কয়েকবার ছবিটা দেখে এলো। বোধ করি এই নূতন অসাধারণ আক্ষেপে সতীশের দেহের রক্তের প্রকৃতি বদলে গেলো, তাকে তাপে তপ্ত ক'রে দিয়ে তার রক্তকণিকায় হেমোগ্লোবিন বেশি করে পুঞ্জীভূত হলো। দিন পনেরোর মধ্যে সতীশ নিজে ও তার বন্ধুরা লক্ষ্য করলে, তার দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার চোখের দৃষ্টি সমুজ্জ্বল প্রখর, সে শক্তিতে অধীর। সে বেড়েছে, ভাষায় যাকে বলে, 'বিয়ের জল গায়ে লাগা' কিশোরী বা প্রথম-যৌবনার মতো। অর্থাৎ উত্তেজনায় আক্ষেপে নববিবাহিতার মতো তার দেহের এণ্ডোক্রীন জগৎ উন্মাদ।

কে এক কবি বলেছিলো, সকল তীর্থ ঘুরে এসেও 'তবু ভরিল না চিত্ত।' সতীশ তার মনোমন্দিরে ছোটো বড়ো নানা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেও তৃষ্ণার্ত হয়ে রইলো, তবুও তার চিত্ত ভরলো না। সে-রাত্রে কমলা এলো, সতীশ তাকে কয়েকবার দূর-থেকে দেখেছিলো। কমলা এলো কাদামাখা কাপড়-পরা, কিন্তু তখনো তার সঙ্গে শুভদৃষ্টির ক্ষণটুকু এলো না। নূতন জীবনের মতো কমলার উদয় হলো বাথরুম থেকে, সদ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা, তার অঙ্গে সতীশের পাজামা কুর্তা। সতীশের দেহের রোমকূপগুলি শত সহস্র ক্ষুধিত গহ্বরের মতো জেগে উঠলো। হৃদপিণ্ডের ত্রিকোণ স্থানটুকুতে তার প্রাণ জড়ো হয়ে উঠলো বিদীর্ণ হবার জন্য। আকাশের বিভ্রম-করা অস্থির বিজলী তার দেহের

শিরায় উপশিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রাণমূলে গিয়ে পৌঁছল। একসঙ্গে রেলভ্রমণের কালে সতীশের মন থেকে তার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলি বিদায় নিলে, সেখানে তখন কমলা অধিষ্ঠিত। কিন্তু এতো কাছের কমলা তাদের বাড়ি এসে দূরে সরে গেলো। বাড়িটায় পুরুষালি প্রতাপ, অন্তঃপুর ও পুরুষমহল গঠনে ও গৃহকর্তার প্রভাবে আলাদা। চন্দনার কাছেই সতীশের আসা-যাওয়া যখন-তখন সম্ভব হতো না। চন্দনা তার আবেদন শোনা শেষ হলেই বলতো, অব তশরীফ লে যাইয়ে মেহরবান। পদ্মার সঙ্গে সতীশের বিশেষ কোনো পরিচয় ছিলো না, অন্য আশ্রিতা পরিজনদের সঙ্গে তো নয়ই। কমলা চারতলায় রইলো সুদূরের শুকতারার মতো। কাছে যাবার বিশিষ্ট কোনো ছুতো না পেলে তার কাছে যাওয়া যায় না। তাও চন্দনাকে এড়িয়ে একা কমলার দেখা পাবার যো নেই। বৃজবিহারী বাড়ি আসায় সতীশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলো, দাদাকে সে চিনতো। মনে মনে আশায় একটা আশ্রয় গড়ে সে কমলাকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলো। এ-সব ছাড়া কমলার কাছে যখন তখন যেতে তার লজ্জাও করতো।

কালেজে ফিরলেও কমলা তার ছোটো ঘরটুকুতে নিরন্তর হানা দিতে থাকলো। একদিন কি ভেবে সে কমলার পরিত্যক্ত কুর্তা পাজামা পরলে, তার বিষম জ্বর এলো দেহের ও মনের শিহরণকে ছাপিয়ে। ডাক্তার ব'লে গেলো ম্যালেরিয়া। বেচারা তিনদিনে বৃথাই আশি গ্রেণ কুইনিন গিললে। শিহরণ অন্তে তার জ্বর আপনিই গেলো।

সতীশের কালিদাস ভবভূতি পড়া মন, তাই সে-মন স্পর্শকাতর। তার চিত্ত সর্বদা হারাবার জন্য উন্মুখ। বয়ঃসন্ধির প্রভাবও আছে তাতে। দয়ানন্দের মতো তার মন কঠিন হিসাবী নয়। সে কালেজে যায় আসে, মন লাগে না কিছুতেই ; তাই লক্ষ্যশূন্য হয়ে টো-টো ক'রে সারা শহরটা ঘুরে বেড়ায়। সুজাতাকে কমলার চুড়ি দিতে গিয়ে তার বিলুর সঙ্গে ভাব হয়েছিলো। সুজাতার দরজায় তখন প্রহরীর দৃষ্টি ছিলো কিনা কে জানে, কিন্তু প্রত্যক্ষ-ভাবে কিছু ছিলো না আর। তবুও বিলুর কাছে যেতে তার লজ্জা করতো--সে-যাওয়ার কোনো অর্থ নেই ব'লে, যদিও সতীশ জানতো যে কমলা বিলুর মাঝে প্রকাশিত, লজ্জাটা তার সেই জন্যই।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে সতীশ স্থানীয় মিউজিয়মে গিয়ে উপস্থিত হলো। আগে কোনোদিন সে ছাউনির নিচেকার প্রস্তর মূর্তিগুলো কাছে গিয়ে দেখেনি। একটা সাইপ্রেস ঝাউ-এর গায়ে বাইক্‌টা ঠেস দিয়ে রেখে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দেখলে ভাঙা, ক্ষতবিক্ষত, বর্ষা-বায়ু-বয়সে ক্ষুণ্ণ কতো মূর্তি। তার মনে হলো, সেগুলোর অবয়বে যেন গঠনের স্বৈরাচার, প্রকৃত মানুষের দেহের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য দূরের, প্রকৃত মানুষের তুলনায় সে-সব মূর্তির যেন ক্ষুব্ধকরা রূপ। মূর্তিকারদের শিল্প-নিয়ম এক-ছাঁচে ঢালা, প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে সে-নিয়ম দেহাতীত যাই খুঁজে বেড়াক তাতে রূপ নেই, আছে বরং বীভৎসতা। সতীশ এই প্রথম ব্যর্থতায় কিন্তু পালালো না ; দেখে বেড়াতে লাগলো। কৌশাম্বীর একটা

নাসাবাহুহীন মূর্তি এক সময়ে তার অন্তর্দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করলে, সে-অন্তর্দৃষ্টি তার হঠাৎ বিমূর্তিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। নিরেট বেলে পাথরের বিক্ষত মূর্তিটায় যেন এক বিচিত্র রস জাগলো! সতীশের মনে হলো মূর্তিটার বুকের কাছে যেন প্রাণের স্পন্দন। যে বিমূর্তির উপলব্ধি জাগে বহু অপেক্ষায় অনুশীলনে তার চিত্তধারার কারণে সতীশের মনে তা জাগলো আকস্মিকভাবে। তার চিত্তধারা আপন আবেগে বহুদিন পূর্বে বিমূর্তির ক্ষুধায় ভরে উঠেছিলো। সে যতো দেখে তার মনে ততো নূতন কম্পমান অনুভূতি জাগে। সে বুঝতে পারে পাথরে উৎকীর্ণ এই সকল তনু তনুর অতীতে গিয়ে পৌচেছে। যে-তনু সাধারণ ব্যক্তি কোনোদিন সুন্দরতম মানুষকেও মধ্যস্থ ক'রে লাভ করে না, পায় না দৃষ্টির অতীত দৃষ্টি। চোখ ফেরাতে একটু দূরের দুটি মূর্তি যেন সতীশকে কাছে ডাকলে। ছাউনির মূর্তিগুলোয় তখন হাতছানি জেগেছে, একজন ডাক দিচ্ছে আর একজনকে। প্রত্নতত্ত্বের জড় মৃতের সীমানা ছাড়িয়ে জেগেছে এক নূতন প্রাণভরা মৃত্যুহীন জগত যাতে এরা ছিলো, আছে, থাকবে প্রাণময় হয়ে মানুষের দিব্যদৃষ্টি যেথায় সজাগ।

সতীশ মূর্তি দুটির কাছে গিয়ে শিউরে উঠলো। একটি অক্ষত, অন্যটি ক্ষতে ভরা। দুটিই এক ফলকে উৎকীর্ণ। মনে হয় ফলকটা আরো বড়ো ছিলো, আরো সখি ছিলো এ-দুটির। সে মূর্তি দুটির পরিচয়লিপিটা পড়লে : এরা সপ্তমাতৃকার দুজন, কৌমারী ও

ইন্দ্রাণী, কোনো অজ্ঞাত গৌড়ীয় শিল্পীর দ্বারা উৎকীর্ণ। এ-ফলকের আরো পাঁচটি মূর্তি পাওয়া যায়নি, যদিও আর একটি ফলকে তারা বর্তমান - থাক বর্তমান।

সে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো এদের। তার মনপ্রাণ হঠাৎ আকুল হয়ে ব'লে উঠলো, কৌমারী ? তুমি কৌমারী নও, ভিনস নও, হ্যাথর নও, রতি নও, তুমি কুমারী কমলা, তার তনুর অতীত তনু ; আজকের কমলার কতো শতাব্দীর পূর্বের বিমূর্ত রূপ ! কৌমারীর অপূর্ব দেহভঙ্গিমা সতীশের মানসপটে মুদ্রিত হয়ে গেলো। তার মনে হলো, কমলার তনুর অতীত এ-তনু সজীব, স্পন্দনশীল। তার প্রতি অঙ্গে ভাষা মাখানো, তার মুখ কমলারই মতো বুদ্ধিদৃপ্ত বিকর্ষণী। পাথরের মূর্তিরও কি মানবদেহের মতো ত্বক আছে ? সে-ত্বক কি স্পর্শকাতর ? সে-ত্বক কি মানুষের ত্বকের মতো আবেগের উচ্চাবচতায় কখনো উষ্ণ কখনো শীতল ? কৌমারীর নাভিদেশে নিতম্বে টোল, যৌবনহিল্লোল। সে-টোলে রক্তমাংসের সজীবতা। সতীশ হারিয়ে ফেললে নিজেকে। কৌমারীর মুখ উঁচুতে, নাগালের বাইরে। হঠাৎ বিমূর্তি-উন্মাদ এই ছেলেটা অতীতকালের সে-মূর্তিটার নাভি-নিতম্বে বারবার আকুল চুম্বন করতে লাগলো।

সেদিন তোমাকে তোমার আত্মশক্তির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কম্‌লা। মেনে নিয়েছি তোমাতে শক্তির ইঙ্গিত একটু আছে। কিন্তু যাতে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছো তার জন্য ও-ক্ষীণ শক্তিটুকু যথেষ্ট নয়, বেটি।

কয়েকদিন পরে কমলার আবার ডাক পড়েছে। সে বললে, বলুন কি করবো? আমার ও-বিষয়ে কোনোই অনুভূতি নেই। আমি কেবল এ-আলস্য দূর করতে ব্যগ্র হয়েছি।

ভবানীশঙ্কর মৃদু হাসলেন, বললেন, আলস্যকে নিন্দা ক'রো না বেটি, তাহলে আমার নিন্দা করা হবে। তোমরা ক্রিয়াকে বড়ো জেনে এই ক্রিয়া-পাগল যুগে নিজেদের ক্ষয় করবার পথে চলে গেছো, জড়িয়ে গেছো নিজের জালে। আলস্যের মাধুর্য, আলস্যের মূল্য তোমাদের কি ক'রে বোঝাবো! সত্যিকারের অলস হওয়া জীবনশিল্প, কম্‌লা। প্রকৃত যে অলস সে সাধনায় স্বর্গলাভ করেছে। সভ্যতা এই অলসেরই গড়া। শিল্প বিজ্ঞান ধর্মে

অলসেরই ছাপ দেওয়া। আলস্যের অবসর ভিন্ন গঠন নেই বেটি। আলস্য না হলে নিভৃত প্রাণের দেবতাও জাগেন না। অলসের চিন্তাতেই সকল গভীর ক্রিয়ার উৎস। প্রকৃত অলসের দেহটাই অলস, মন নয়। সে মনে মনে সকল বস্তুর মূল্য খতিয়ে দেখে আর বলে, ইহ বাহ্য, ইহ বাহ্য, ইহ বাহ্য। এই বাহ্যকে ত্যাগ ক'রে ক'রেই সে প্রকৃত বস্তুটিকে পায়, আবেষ্টনের প্রয়োজনকে সন্দেহ ক'রে মনের ভিতরেই খোঁজে আনন্দকে, যাকে তোমরা বলো সংস্কৃতি—কল্‌চর। অন্ধ ক্রিয়ার ঘোড়দৌড়ের পথে, চিন্তাহীন আচারে, উপলব্ধিহীন কপচানো বুলিতে সেটা পাওয়া যায় না, যতোই না কেন কল্‌চর-কল্‌চর ক'রে চেঁচামেচি করো।

কল্‌চরকে সজ্ঞানে গড়তে হয় না কম্‌লা, কেউ পারেও না গড়তে। যুগযুগান্তরের আলস্য বিলাস সম্প্রসারণ খেয়াল ক্রিয়া বেদনা, কতো কি জড়ো হতে থাকে কালের গর্ভে। কালের অ্যালকেমি সে সকলের যে সংশ্লিষ্ট রস বিতরণ করে তাকেই আমি কল্‌চর ব'লে জানি বেটি। সে-রসে মানুষকে সিক্ত ক'রে দেবার জন্য এই কালই আনে মাঝে মাঝে যুগমানবদের ডেকে। এই যুগাবতারদের কাজ ইহ বাহ্যের উপায়ে উপযুক্ত রস চয়ন ক'রে বন্টন ক'রে দেওয়া। তিনি এ গম্ভীর বাক্যটা ব'লে হো হো ক'রে হাসলেন, কমলাও মৃদু হাসলো।

কম্‌লা, তফাৎটা এখনি প্রমাণিত হয়ে গেলো। আমি আলস্যের রাজা ব'লে এ বুড়ো বয়সেও বালকের মতো হাসতে পারলুম কিন্তু

তুমি এখনো দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো হয়েও কর্মশীলতার ধাঁধায় অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসলে। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি তোমার কাছে অদ্ভুত প্রস্তাব করতে যাচ্ছি। তোমার পরকালের ভাবনা আমার নয়, কিন্তু তোমার ইহকালের ভাবনাটা আমি খুব বিস্তৃত ক'রে ভেবে রেখেছি।

বলুন পিতাজী।

জলের শক্তি জানো মেয়ে ? আমি তোমার মতো পদার্থবিজ্ঞানীকে *Hydrodynamics* বোঝাবার স্পর্ধা করছিনে। জল উঁচু তলে খানা ডোবা পল্বল—শক্তিহীন, আপনার অলস ভারে আবদ্ধ। সেই উঁচু থেকে নিচে নামার ধারায় জল বেগ আর শক্তি আহরণ করে। যতো নেমে আসে তার ধারা শক্তিটা ততো বড়ো হয়ে ওঠে। অতি নিচুতে সে-জল সাগর, যার শক্তির পরিমাপ নেই। জলের চেয়ে নম্রতা আর কিছুর নেই, তার মতো প্লাবনের শক্তিও আর কিছুতে নিহিত নেই। মানুষও এই বিরাট অপরিসীম শক্তির অধিকারী হয়েছে এই মূল্য খতানোর ইহ বাহের পথে, আপনাকে বিলীন ক'রে চরম নম্রতা আর ধৈর্য দিয়ে। এ অপূর্ব ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী একমাত্র গান্ধিজী, ইহ বাহা ক'রে ক'রে প্রকৃত জীবনমূল্যের পরশ পাথরটি তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তুমি কেন আর কেউ বোধকরি আর সে অলৌকিক শক্তি লাভ করবে না।

কমলা বিস্ময়ে ভবানীশঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তাঁর প্রসন্ন মুখে তখন ফরসির নল ফিরে গেছে।

আমার গান্ধিজীর উপলব্ধি যেন বিচিত্র অবর্ণনীয় এক দেহাতীত মনাতীত শুদ্ধতম ও প্রবলতম শক্তির সত্তা। কিন্তু ও কথা আর নয়। তোমার দেহ আছে মন আছে, তোমার নিজেকে শক্তিমতী করবার উপায় উপকরণ ওই দুটি। আত্মা তোমার হয়তো বা আছে। আমি সোজা সরল জীবাত্মাটার কথা মনে করছিনে। দেহমন যখন পুষ্ট হবে তখনই কেবল তোমার আত্মার খোঁজ করতে পারবো। এ-কথায় অপমান বোধ করছো না তো ?

না পিতাজী।

তুমি কেবল খান কয়েক বই পড়েছো বেটি। সাধারণ মানুষের হয়তো সে-কারণে রাজা ক্যানুটের মতো অহমিকা, ক্ষুদ্র অভিমান হতে পারে। কিন্তু যা করতে যাচ্ছো তার উপযুক্ত উপকরণ, উপযুক্ত অস্ত্র তোমার হাতে কিছু নেই। প্রকৃত সেনানী হতে গেলে পাকা বনেদের দরকার, কমলা। সবল দেহ না হলে ইন্দ্রিয় সবল হয় না। সবল ইন্দ্রিয় না হলে মন সবল নয়। ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি না হলে সুখ দুঃখের গভীর বোধ নেই। স্পিরিটকে শুধু বড়ো করতে গিয়ে তোমরা ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধির সর্বনাশ করেছো। বধির যে সে আত্মার সব চেয়েও বড়ো প্রকাশ সেই সুরের আনন্দ জানে না। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সূর্যোদয় ও অস্তরবির রূপ থেকে চিরবঞ্চিত। অঙ্গে যার স্পর্শবোধ নেই ধরণী তার কাছে অবলুপ্ত। তাই তোমাকে দেহমন সজাগ করতে বলছিলুম।

কমলার কিছু বলবার ছিলো না, সে চুপ ক'রে রইলো।

একটু পরে ভবানীশঙ্কর বললেন, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো। কোনো কালে, জীবনের এ-বাঁকটা পার হয়ে গেলে তুমি কি বিবাহ করবে?

কমলা মুখ তুলে উত্তর দিলে, আগে ও-কথাটা কখনো ভাবিনি, পিতাজী। কিন্তু এখানে এসে স্থির হয়ে গেছে, আমি আর ওপথে যেতে পারিনে, আমার যাবার সাধ্য নেই।

তোমার যখন যাবার দিন আসবে তখন হয়তো ও-কথাটা তুলতে পারি, আজ ওটা থাক। আমি বলছিলুম, নিজেকে বিস্তার ক'রে নাও এই বেলা, যখন হাতে সময় আছে। তোমাকে বিশ্বাস করানো শক্ত যে যেমন তোমরা নিজেকে হারিয়েছো প্রগতির মরীচিকাকে ধরতে গিয়ে সুখ আর তৃপ্তিকে বিনষ্ট ক'রে, তেমনি সভ্যতার বিকৃতির পিছনে ধাওয়া ক'রে সুন্দরকে হারাচ্ছো। আজ মানুষের দৈনন্দিন সর্বনাশ, সুন্দরের পাদমূল থেকে দূরে সরে যাওয়া। তুমি সুন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও, বেটি। সুন্দরের উত্তাপ না পেলে তোমার হৃদয় উষ্ণ হবে না। হৃদয় উষ্ণ না হলে মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতে ভালোবাসতেও পারা যায় না, কমলা। য়ুরোপে শুধু সুন্দরের মৃত্যু নয়, মানুষের উষ্ণ আবেগেরও মৃত্যু হয়েছে। তাই না নিরন্তর এই হত্যালীলা! ভগবানের শক্তির চেয়েও বড়ো শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে ও-দেশের মানুষ মদমত্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সুন্দরের শক্তিকে ওরা খুঁজে পায়নি।

তোমাকে সুন্দরের দোহাই দিয়ে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করছিনে, বেটি। বরং আমি বলবো, ভারতীয় মানুষের অধিকার, তার সুখ দুঃখের কথাটা পরে ভেবো। আগে দাসত্ব ঘুচুক তোমাদের হাত দিয়ে। সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি আগে হাতে আসুক তোমাদের।

বলুন আমি কি করবো ?

কি করবে ? সুন্দরকে উপলব্ধি করো যাতে সমগ্র দেশকে সহজের পথে ফিরিয়ে আনতে পারো। সুখকে জানো যাতে সুখবিধান করতে পারো। দুঃখকেও জানো, যাতে দুঃখ নিবারণ করতে পারো। আমার মনে হয়, গান্ধিজীর সহজের শুদ্ধতার লক্ষ্যটুকু কারো কারো কাছে পুরো মর্যাদা পায়নি। তাঁর যে মানুষের প্রতি ব্যাপক গভীর দরদ সুন্দরের অনুভূতির দ্বারা তাও যেন কারো চোখে পড়েনি।

কমলা এই অশ্রুতপূর্ব কথাগুলি শুনে ব্যগ্র হয়ে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলে, এ লক্ষ্যসাধনের প্র্যাক্‌টিকল পথ কি পিতাজী ?

তা আমি বলতে পারবো না, কমলা, বলা সহজ নয়। প্রত্যেক মানুষের মূল প্রকৃতি তার পথ নির্দেশ ক'রে দেয়। তোমার চোখের সামনে আপনি যে-পথ ভাস্বর হয়ে ওঠে তাই তোমার বিশিষ্ট পথ। আমি নিজের কথা বলতে পারি। প্রভাতে ঘাটে দাঁড়িয়ে স্তবগান করি, তা এতোকালে একঘেয়ে অরুচিকর হয়ে যেতো, যদি না আমি জানতুম কাব্য ধর্মকে প্রাণময় করেছে, কাব্যরূপই ধর্মের

মহীয়ান উৎস। আমি ধর্মাচরণ ত্যাগ করতুম যদি না আমি প্রত্যহ মনে মনে নব নব চিত্র, নব নব রূপ দেখতুম। আমার সুন্দর আসেন ওই পথ দিয়ে।

যাকগে। অনেক তত্ত্বকথা ব'লে ফেলেছি মনের ঝোঁকে। এইবার যা বলবো তা হাস্যকর, একেবারে সাব্লাইম থেকে রিডিক্যুলস্।

তিনি বলবার আগেই হেসে উঠলেন। কমলাও ছোঁয়াচে হাসি হেসে চোখ তুলে রইলো তাঁর বলার অপেক্ষায়।

বলছিলুম যে তুমিও আমার মতো মল্লবিদ্যার চর্চা করো।

কমলা সেদিন পর্যন্ত ভবানীশঙ্করের সামনে সশব্দে হাসেনি, এ অদ্ভুত প্রস্তাবে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। ভবানীও হাসলেন তাঁর সরল দিলখোলা হাসি। বললেন, হাস্যকর বটে কথাটা কিন্তু হাসির ও-পিঠে আমার বলার কারণ আছে। ওটা আমার নেশা, তাই আগ্রহটা উৎসাহে দাঁড়িয়েছে। চন্দন বেটিকে বলেছিলুম তার বিয়ের পরে কিন্তু তার সরমোৎপীড়িত মুখ দেখে লজ্জা পেয়েছিলুম নিজেই। তোমাকে আমি নারী ব'লে মনে করতে পারিনে তাই বলতে বাধলো না। সচেতন হয়ে যদি করতে পারো, যদি মনে রাখতে পারো কেন করছি তাহলে দেহে বল শুধু নয়, পাবে বলবত্তর আর সংযত ইন্দ্রিয়, তাতে নূতন বোধ, জীবনে নূতন আত্মসম্ভ্রমভরা দৃষ্টি, যা তোমার সাধারণের চেয়েও বেশি ক'রে দরকার। আমি তাহলে তোমার জন্য পিয়ারীকে রাখবো, সে এখানকার বিখ্যাত নারীমল্ল।

কমলা তাঁর দিকে চেয়ে চুপ করে রইলো।

তোমার চোখে হাসি কেন বেটি ?

হাসি নয় পিতাজী। ভাবছিলুম দেবী চৌধুরাণী কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের আপনার অনুরূপ কল্পনা।

আছে নাকি এ-কল্পনা কোথাও ? গল্পটা বলোতো কম্‌লা।

কমলা অনেকক্ষণ ধ'রে সে গল্পের চুম্বকটা বললে।

ভবানীশঙ্কর ফরসি ফেলে ঋজু হয়ে ব'সে রইলেন। গল্প শেষে উৎসাহিত হয়ে বললেন, মহাপ্রাণ পথনির্দেশ ক'রে গেছেন তখন আর বাধা কোথায় ? মহতের স্বপ্ন পূর্ণ হয়, তোমাকে দিয়ে তা পূর্ণ হোক। তুমিও তো দেবী। আমরা সকল মেয়েকে দেবী বলি। আর ভবানী তো আমি জন্ম থেকে উপস্থিত রয়েছি। সে-দেবীকে ভবানী ঠাকুর গড়ে তুলেছিলো বিদ্রোহিনী ক'রে, তুমি তো আগুন মাথায় ক'রেই এসেছো। কিন্তু তোমার কাজ বাড়লো কম্‌লা। ও-বইটা আমি আনাই, তুমি ওর অনুবাদ ক'রে দাও।

কমলা ভবানীশঙ্করের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে উপরে গেলো। চন্দনাকে বলতে সে হাসলো, বললে, আমি ওঁর ওই একটি কথা রাখতে পারিনি, যদিও ওঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি না এমন আর কোনো কাজ পৃথিবীতে নেই। তুমি পারবে কম্‌লা ?

টেনিস খেলতে যদি পেরে থাকি এটা কেন পারবো না ভাই !

লজ্জা করবে না ?

লজ্জা তো শেখার আর অভ্যাসের বস্তু ! অনেক নারীসুলভ লজ্জা

যেকালে ছাড়তে হয়েছে, এটাও আটকাবে না। আর শিখবো তো আমারই মতো একজন রমণীর কাছে!

ভবানীশঙ্করের নিভৃত কুস্তির মণ্ডপে কানাৎ ঘেরা হলো। পিয়ারীকেও ডাক পড়লো।
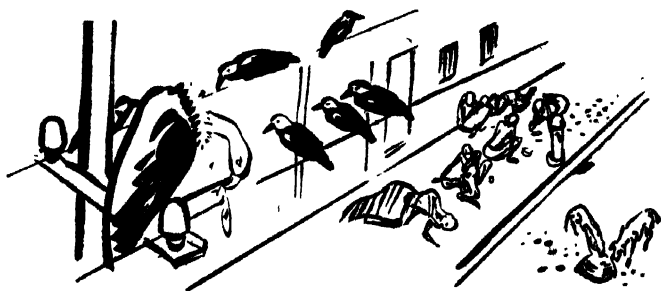
কাঞ্চন আর কামিনী বৃজবিহারীর দুই দেবতা। কাঞ্চন নিরলস পূজার, কামিনীপূজা তার কাঞ্চনসাধনার ফাঁকে ফাঁকে—তাও নিরলস। চন্দনার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিথিল ও জীর্ণ, তাই চন্দনা থাকে চারতলায় আর বৃজবিহারী থাকে দু'মাইল দূরের গঙ্গার ধারের বাংলায়। চন্দনার তাতে খেদ নেই। সে এ-বাড়ির বধূ হয়ে এসেছিলো তার পৈতৃক বংশগৌরবের কারণে। পদ্মার মতো সে খেতাবী রাজার কন্যা তো নয়ই, বরং অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা। কিন্তু মেয়েদের স্বামীর সামাজিক অবস্থার, আচারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতাটা অদ্ভুত আর নিজস্ব, যা থেকে পুরুষ একেবারে বঞ্চিত। চন্দনা এ-সংসারে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো। কাজেই তার স্বামী-সাহচর্যের কামনা ছিলো না, তার মনে স্বামীর জন্য কোনো মায়াও ছিলো না। সে শিখেছিলো যে তার শ্বশুরকুলের মতো অভিজাত বংশের মানুষেরা বংশপরম্পরায় তাদের স্ত্রীর কাছে অন্যত্র ব্যয়িত

আবেগের তলানি একটু নিয়ে কখনো কখনো আসে যায় তারা এক-পত্নীত্বে অভ্যস্ত নয়। বৃজবিহারীর রক্তে আছে সেই প্রেরণা।

চন্দনার সঙ্গে বৃজবিহারীর দেখা তাই কালেভদ্রে, তাতে উভয় পক্ষের কারো কুণ্ঠা ছিলো না, দুজনেই তারা পরস্পরের মন বুঝতো। একবার খেয়ালের ঝোঁকে বৃজবিহারী চন্দনার ঘরের সঙ্গে টেলিফোনের যোগস্থাপন করতে চেয়েছিলো, চন্দনা সম্মত হয়নি। ভবানীশঙ্কর টেলিফোন বস্তুটাকে দেখতে পারতেন না, বলতেন ওটা দিয়ে যার-তার নাগালের ভিতর গিয়ে পড়তে হয়, যে-সে যখন-তখন একা থাকায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ভবানীশঙ্করের যা মত চন্দনারও তাই। বাপের এ-দুর্গে বৃজবিহারী খবর না দিয়ে সহজে আসতো না, চন্দনাও কখনো তার বাংলায় যেতো না।

সকল বাপই বিন্দুমাত্র কিছু না ভেবে সন্তানের নামকরণ করে। কিন্তু কোনো কোনো ছেলের নামটা তার চরিত্রের, তার চিত্তবৃত্তির সম্যক পরিচয় হয়ে ওঠে। বৃজবিহারীর নামটাও সেই হিসাবে সার্থক হয়েছিলো। ভবানীশঙ্করের চরিত্রের বিন্দুমাত্র কোনো প্রভাব তার পুত্রের উপর পড়েনি। তার কারণ বোধ করি এতো বড়ো বাড়িটার আভ্যন্তরিক সহবাস সাহচর্যরোধী দূরত্ব, আর, ভবানীশঙ্করের সুদূরে থাকা। তিনি কারো কাছে আসতেন না, সহজে নিজের মনের কাছাকাছি ডাকতেনও না কাউকে।

কুড়ি বছর বয়স থেকেই বৃজবিহারী তার বিচরণের জন্য দুটি ব্রজ

নির্মাণ করে নিয়েছিলো, একটি ব্রজ কাঞ্চন অনুসরণের, অন্যটি কামিনীর। নিরন্তর ঐকান্তিক সাধনায় সে-দুটিই তার সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠেছিলো। কোথায় কাঞ্চন বৃজবিহারী তার গন্ধ পেতো, যেমন শবের গন্ধ পায় আকাশচারী শকুন। বিবেকের বালাই তার ছিলো না সুতরাং কাঞ্চন বা কামিনী আহরণে সৎ অসৎ কোনো উপায়ের কথা সে ভাবতো না। সংস্কৃত রুচি না হলে কাঞ্চন বা কামিনীলালসা যায় না, তাই বাপের সে-লালসা ছিলো না ছেলের ছিলো অতিমাত্রায়।

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ তখনো প্রকট নয়। অন্যান্য জিনিসের মতো দুর্ভিক্ষেরও গড়ে ওঠার কাল আছে, তাকেও গড়ে তুলতে হয়. অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকস্মাৎ তা আসে না। আগে এ-ভারটা ছিলো অনেকটা নিসর্গের হাতে। নিসর্গ আর মানুষের ভাগ্যবিধাতা মানুষের কাছে হার মেনেছে বহুকাল। বিধাতা অবলুপ্ত, নিসর্গ এখন গৌণ কারণ মাত্র। সৌধ গড়তে যেমন বিচক্ষণ কারিগরের দরকার, দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল-সৌধ গড়তেও তেমনি। বৃজবিহারী অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে আরো পাঁচজনের মতো সে-সৌধ গড়ার নেশায় মত্ত হলো। দেশের এ-কোণে ও-কোণে অনশনের কান্না যখনি ওঠা উচিত ছিলো তখন উঠলো না। ভরপেট খাওয়া যাদের বারোমেসে ব্যাপার তাদের নাড়ী একটু ক্ষুণ্ণ হলেই কেঁদে ওঠে। নাড়ী চিঁচিঁ করা যারা বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারে পেয়ে এসেছে তারা সহজে কাঁদে না। ক্ষুধিত নাড়ীকেও

তারা স্তোক দিয়ে থামিয়ে রাখতে জানে। বৃজবিহারীর দল এই ক্ষুধিতের নাড়ীর দড়ি পাকিয়ে কাঞ্চনসমুদ্র মন্থন করতে লাগলো, মানুষের প্রাণ-চোঁয়ানো পরমামৃতের সন্ধানে।

সেকালে দেবতা-দানবে মিলে মন্থনদণ্ডে পাঁক দিয়েছিলো, এবার পাকের মৈনাকটাকে ঘোরালো একদিকে দেশের রাজা-রাজপুরুষ অন্যদিকে দানব নয়, দানবের চেয়েও ভয়ানক, লোভে প্রস্তরীভূত-হৃদয় মানুষ, মানুষের ইতিহাসেও যে-মানুষের আগে ছায়াপাত হয়নি, যে-মানুষ সকল মানবধর্মকে নিজের বুকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছে। এ রাজার সহায়ে গড়া নবতম দানব যার লোভ আকাশের গৃধিনী আর মাটির শবভোজী কীটকেও হার মানিয়েছে।

পুরনো অমৃতমন্থনে সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য কণ্ঠে বিষ ধারণ করতে হয়েছিলো শিবকে, একের বিনষ্টির দ্বারা বহুর বিনষ্টি নিবারণ করতে। এ নব মন্থনে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু বিষধারণ করলো—এ-কালের ভাষায়, একটি সমগ্র অর্থ নৈতিক মানবগুর সে-বিষে শিব হয়ে গেলো। আশ্চর্য এই যে, এই জীবন্মৃতের দল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও নীরব রইলো, অবশেষে নিজেরা মৃত্যুতে বিলীন হয়ে গেলো। যারা তাদের ধ্বংস ঘটালে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মত্ত ক্ষুধায় তাদের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে রক্তপান ক'রে গেলো না। বংশানুক্রমে তারা মহাভারত নাড়াচাড়া ক'রেও অঞ্জলি ভ'রে দুঃশাসনের রক্তপান করার কথাটা নিজেদের চরম

সঙ্কটকালেও ভুলে গেলো। তাদের বংশলোপ হবার আগে তারা পদাঘাতে এই বাংলাদেশটাকে তার নির্বীর্য নারায়ণ আর অন্নপূর্ণার সঙ্গে চিরকালের জন্য বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দিয়ে গেলো না। নিজেদের গভীর অতৃপ্ত ক্ষুধার প্রতীক রেখে গেলো না ভারতভূমির এই অংশে চিরদিনের জন্য আসমুদ্র হিমাচল বিরাট ক্ষুধিত একটা অতলান্ত গহ্বর।

যুক্তপ্রদেশকে বেড়াজালে ঘিরে বৃজবিহারী এ-দেশের খাদ্যশস্য লুণ্ঠনে মত্ত হয়ে গেলো, আর, সেই মত্ততায় কমলাকে না ভুললেও তার অনুসরণটুক্ স্থগিত রাখলে আপাততঃ। সেই মণি-খচিত কণ্ঠহারটার কথা মনে পড়ে গেলে সে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতো। নিজেকে বলতো, কমলা ঘরের ব'লে দাম লাগবে আরো কিছু, আরো হাজার পঞ্চাশ। চন্দনার আত্মীয়া না হলে ও-দামের সহস্রাংশও প্রয়োজন হতো না। দ্রৌপদীকে ঘিরে সারা কুরুক্ষেত্রেও এতো দাম লাগেনি। কমলা যে তাকে ভুলে যেতে পারে একথা বৃজবিহারী অসম্ভব ব'লেই জেনে রেখেছিলো। সে আর নিজে এলোনা, না পাঠালে আর কোনো উপঢৌকন।

কয়েক মাস পরে একদিন বৃজবিহারী চন্দনার ঘরে এলো। চতুর দৃষ্টিটা চন্দনা স্বামীর মুখে বুলিয়ে বুঝে নিলে এ-আগমন কেন, আসাটা কার কাছে। এ কয়েক মাসে সে বুঝেছিলো যে কমলাকে

নিজের আঁচল দিয়ে রক্ষা করবার প্রয়োজন নেই, সে নিজেই পারে নিজেকে সামলাতে। বৃজবিহারীর অনুরোধে সে কমলাকে ডাকতে গেলো, কিন্তু এবার আর আগেকার মতো বললে না যে দুয়ারে ব্রজবিহারী, বৃন্দাবনের সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। চন্দনা আনমনা গম্ভীর হয়েছিলো।

চক্ষুভরে কমলাকে দেখে নিয়ে বৃজবিহারী প্রশ্ন করলে, সে-হারটা পরেন না বুঝি?

কমলা হাসিমুখে উত্তর দিলে, সেটা পরার ক্ষণ আসেনি এখনো। বৃজবিহারী সে-কথাটায় নিজের মনের মতো একটা অর্থ আরোপ ক'রে উল্লসিত হয়ে উঠলো। চন্দন ও কমলা দুজনেই তার চোখের সে-উল্লাস লক্ষ্য করলে।

বৃজবিহারী বললে, আপনার সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ করবার আজও সুযোগ করতে পারলুম না, ঘুরে ঘুরেই দিনগুলো বৃথা কেটে গেলো। আজ চললুম কলকাতা। ফিরে এসে এবার আপনার সেবার দিকে দৃষ্টি দিতে পারবো। বৃজবিহারী নিজেকে বলতে বলতে গেলো, এবার দূরে গিয়েও তোমার কাছে এলুম।

চন্দনা তার গমনপথের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ শিউরে উঠলো। তার মন তখন বৃজবিহারীকে লক্ষ্য ক'রে বলছে, আর যেন ফিরে না আসো। তার মনে যেন অনুভূতি, এ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আসবে এই বাড়িটার নূতন কোনো অদৃষ্ট। তার চোখের সামনে কালো একটা ছায়া খেলে গেলো।

কয়েক দিন পরে একদিন কমলা জিজ্ঞাসা করলে, চন্দন, পদ্‌মাকে দেখিনে, সন্ধ্যায় তেতলা থেকে ধূপের গন্ধ আসে না আর, কেন বলতো?

পদ্‌মা যে এখানে নেই, কাশী গেছে তার বাপের বাড়ি, ফিরে আসবে যখন খুশি।

কমলার দেখা না পেয়ে দয়ানন্দ্ লজ্জিত হয়েছিলো। নিজেকে সে বুঝিয়েছিলো, এ-দেখা পাওয়ায় তার অনধিকার তাই দেখা হয়নি।

মাস দুই পরে হঠাৎ একদিন বাক্স-বিছানা বেঁধে দয়ায়ন্দ্ সতীশকে বললে, দেশে ফিরে চললুম সতীশ। পড়তে গিয়ে আমার ক্ষতি হয়েছে অনেক, পড়া আর নয়।

বিপ্লব অন্তে এই তার প্রথম দেশে যাওয়া। সে কোনো ক্ষতির কল্পনা করেনি, তার মন ঘুমিয়ে ছিলো ব'লে। বালিয়ার বিষয়ে যা কানাঘুষা সে শুনতো তার কিছুই তার মনে স্থান পায়নি। সে জানতো জগতের গতি অনাহত, যা যেমন চলছিলো সেই নিয়মেই চলছে।

কিন্তু ধর্ষিত দেশ দেখে তার বুক কেঁপে উঠলো। প্রতিহিংসা ধর্ষণচিহ্ন লেপে দিয়েছে বালিয়ার সর্বাঙ্গে। যেখানে তার গৃহ ছিলো গৃহ ব'লে সেখানে আর কিছু নেই, শুধু দেওয়াল কয়েকটা

দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালের মতো। তারই এক কোণে নূতন একটা খড়ের চালা। সে আশ্রয় থেকে দয়ানন্দের ডাকে এক কঙ্কালসার, জীর্ণ, আতঙ্কিতমুখ রমণী বেরিয়ে এলো। দয়ানন্দ্ চিনলো তাকে, এই রমণী একদিন তার মা ছিলো—প্রসন্নবদনা, আপন অদৃষ্টে তৃপ্ত, পুত্রের শুভচিন্তায় কেন্দ্রীভূতহৃদয়। দয়ানন্দ্ মা-কে দেখে পাথর হয়ে গেলো। মা তার কাছে এলো, চুপি চুপি বললে, লুকিয়ে পড়, বেটা, এ-দেশে অন্ধকারে সাহস, আলোয় ভয় ছড়ানো।

দয়ানন্দ্ ডাকতে যাচ্ছিলো অম্মা ব'লে, তার কণ্ঠে আর স্বর ফুটলো না। তাঁর ঠোঁটে ব্যর্থ-ভাষার কাঁপন দেখে মা তার কানে মুখ রেখে বললে, কথা কস্‌নি বাবা, বাতাস কথা কানাকানি ক'রে দেবে এখনি। দেখ, সকাল বেলা পাখিও ডাকে না আর। বোমা আর গুলি এড়িয়ে তাদের মধ্যে যারা এখনো আছে তারাও বোবা হয়ে গেছে।

মা তার সত্যই বলেছিলো, বাতাস হেথায় কথা কানাকানি করে। অবিলম্বে থানা থেকে দয়ানন্দের ডাক এলো। মা তার শিউরে উঠলো, কিন্তু কাঁদলে না, হাহুতাশ করলে না। ওদেশের সকল নারীর তখন অশ্রু শুকিয়ে গেছে। মা জানতো, যাদের থানার ডাক আসে তারা আর ঘরে ফিরে আসে না। বহু সৌভাগ্যের জোরে দয়ানন্দ্ দিন পনেরো পরে ফিরে এলো। কিন্তু এলো নূতন অনুভূতি নিয়ে।

থানা যেতেই সে আটক হয়েছিলো। দিনের পর দিন তার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখলে না. কোনো প্রশ্নও করলে না কেউ, তার কি অপরাধ, অপরাধ না থাকলে কেন নেই। এ নিরবলম্ব অবস্থাতেও সে প্রকৃত অপরাধীর মতোই দুঃখের দিন কাটাতে লাগলো। দয়ানন্দের শঙ্কিত-প্রাণে সকল অনুভূতিই যেন উষ্ণতা হারিয়ে শীতের আবহে জমে গিয়েছিলো। বিনা বিচারে বন্ধন শক্তিমান যুবকের অদৃষ্টলিপি এ-দেশে, সে-কথা সে ভালো ক'রেই জানতো। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সে আশা করছিলো যে বিনা প্রশ্নে বিনা অনুসন্ধানে হঠাৎ একদিন সে-ও স্থানান্তরিত হয়ে যাবে কোনো অন্ধকার অনির্দিষ্ট কারাগারে, যে-বন্ধনে মানুষের ন্যায়সঙ্গত বিচার পাবার অধিকারটুকু সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত।

অসহ্য দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে একদিন তার ডাক পড়লো। প্রথম সম্ভাষণের কদর্য ভূমিকাটুকু এ-আবেষ্টনের অঙ্গ, কেউ তা ধর্তব্যে আনেনা, তা শুনে কোনো বন্দী আজ পর্যন্ত বধিরও হয়ে যায়নি। দয়ানন্দ্ অনভ্যস্ত কর্ণে সে সম্ভাষণ শুনে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠলো এই যা, যে-চমকানো হঠাৎ আঘাতের, অপ্রত্যাশিত অপমানের। অঙ্কের ছাত্র দয়ানন্দ্ হাইপথেসিস্ বোঝে, এ-হাইপথেসিসটাও বুঝলো যে যার বালিয়ায় জন্ম, বয়সে যে যুবক, পরিচয়ে যে ছাত্র সে আজকের দিনে অপরাধী হতে বাধ্য। হাইপথেসিস্ কোনো বিচার্যবস্তু গড়ে তোলার ভিত্তি, দয়ানন্দ্ এ-ভিত্তিগত সিদ্ধান্তটুকুকে খণ্ডন করতে পারলে না, কারণ তার

জিভে জড়তা আর বুদ্ধি অসাড়। এই জড়তা আর অসাড় বুদ্ধি কিন্তু তাকে রক্ষা করলে। বিচারকালে সে কোনো উত্তর দিলে ঔদ্ধত্যের দায়ে পড়তো। উত্তর না দেওয়টাই তার অনুকূল হলো। অন্য পক্ষের অন্যত্র কার্যকরী সিদ্ধান্তটা ঘুলিয়ে দুর্বল হয়ে গেলো। প্রশ্নকর্তা তাকে মূর্খ কেতাবকীট ব'লে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে, বললে, সরকার বাহাদুরের কয়েদখানায় জড়ভরতের স্থান নেই, তুই দূর হ। পদাঘাত তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালে। একটা সেপাই তার কান ধ'রে থানা থেকে বার করে দিলে। এই কর্মচারীরা তখন শক্তি-অন্ধ।

কেউ দয়ানন্দের কাছে মুক্তির কোনো দাম দাবী করলে না। তারা তার মা'কে চিনতো আর জানতো দেবার মতো অবশিষ্ট সে স্ত্রীলোকটির কাছে আর তারা কিছু রেখে যায়নি। দয়ানন্দ বহুকাল থেকে জলপানির টাকায় লেখাপড়া ক'রে এসেছে, মা-র কাছে তার হাত পাততে হতোনা। সে জানতো না যে বর্তমানে তার মা আর পাঁচজন সর্বস্বান্ত ভদ্র-ভিক্ষুকদেরই একজন, একাহারের জন্য দয়ার দান মুষ্টিভিক্ষাই তার ভরসা।

পদাঘাতের অপমান আর কানের জ্বালা তার মনে নিরন্তর রাবণের চিতার মতো জ্বলতে থাকলো। সে জ্বালায় শৌখিন দেশচিন্তা, কমলা—সব পুড়ে গেলো। দয়ানন্দ দিন কয়েক জড়ের মতো পড়ে রইলো, কিন্তু অবিরাম জ্বালাটা ক্রমশঃ তার অনুভূতি জাগিয়ে তুললে। কিছুকাল আগে দেশের কথা ভাবতে গেলে তার

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইংরেজকে মনে পড়ে যেতো। কিন্তু তার নবীভূত দৃষ্টি দিয়ে আর সে ইংরেজ দেখতে পেলে না, দেখলে কালো ইংরেজ, তার মতোই এদেশী মানুষ, কিন্তু কলুষের কালোয়, স্বজাতি নিপীড়নে যারা ইংরেজকেও অনেক পিছনে ছাড়িয়ে এসেছে। তার মনে খুব বেশি ইংরেজ-প্রীতি না থাক, সে এদেশী শাসকসম্প্রদায়ভুক্ত ইংরেজের ইতরতার জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতিটাকে কোনো দিন দোষী করেনি।

ভাবতে ভাবতে দয়ানন্দের মনে হয়, এ-সকলের স্বাভাবিক পরিণতিই তো 'কুইট ইণ্ডিয়া' দাবীটা। কিন্তু ইংরেজ তল্পি-তল্পা নিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে গেলেও দেশকে সম্পূর্ণ নির্মল ক'রে তোলা অসম্ভব কথা। প্রায় দুশো বৎসরের প্রয়াসে গড়ে তোলা এই কালা ইংরেজ যাবে কোথায়? তাদের চকিত পরিবর্তনই বা সম্ভব হবে কি করে? কালক্ষেপে যে-ধরনের রাষ্ট্রই আসুক এদের মালিন্য পাপ তাকে কলুষিত করবেই দীর্ঘকাল ধ'রে। ইংরেজ গেলেও ইংরেজের আবহ এরাই বাঁচিয়ে রাখবে অনেক কাল। প্রকৃত মুক্তি কোথায়? ভারতীয় রাষ্ট্র-কল্পনাকে ইংরেজ এদের দিয়েই আচ্ছন্ন চিরবিপন্ন ক'রে রেখে গেলো।

দয়ানন্দের কাছে 'কুইট ইণ্ডিয়া' হঠাৎ অসার হয়ে গেলো। প্রেতাত্মার মতো ছেড়ে গেলেও ইংরেজের আত্মা ভারতের সর্বত্র কিছুকাল হানা দিয়ে বেড়াবে। দেশ অবনত, ইংরেজের শোষণ তার একমাত্র কারণ নয়, তার আরো প্রচণ্ড, আরো গভীর কারণ

আছে। কাঠের সব চেয়েও মারাত্মক রোগ ঘুণ ধ'রে যাওয়া। ভারতের রাষ্ট্রদেহে ঘুণ-ধরা। দেশের কাঠামোটার সর্বাঙ্গে ঘুণের পীড়া। ইংরেজের প্রখর প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি এ-দেশে সেই বিষম কীটাণুটার আক্রমণ অব্যাহত রেখে গেলো। রাজা জমিদার খেতাবী মদান্ধ কর্মচারী এই ব্যাপক সজীব ঘুণ। উই-এর শক্তির মতো ঘুণের শক্তিও অপ্রতিহত, যা জীবনের মূলকেও ক্ষুণ্ণ করে।

কানের জ্বালাটাই দয়ানন্দকে ওঠালো, নূতন ক'রে জাগালো। নিরীহ দয়ানন্দ অপমানে হিংস্র হয়ে উঠলো। বৃষোৎসর্গের ছাপ-দেওয়া বৃষের যেমন কোথাও আটক নেই, তার সর্বত্র গতি, জড় ব'লে পুলিশের ছাপ দেওয়া দয়ানন্দেরও তেমনি গতিবিধির কোনো বাধা রইলো না। সে ঘুরতে লাগলো গ্রামে গ্রামে, অতৃপ্ত ক্ষুধা দেখে, আতঙ্কিত মুখ দেখে, চাপা কান্না শোনে, প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অত্যাচারের চিহ্ন গোনে।

বালিয়া ঠাকুরের দেশ, যে-ঠাকুরেরা একদা বীর ছিলো, যোদ্ধা ছিলো। দয়ানন্দ বোঝে, তার দেহেরই মতো সেই ঠাকুরদের দেহে ছাইগাদার কুকুরের শীতল শোণিত। তাই সম্ভব এই আতঙ্কিত মুখ, এই চাপা কান্না, এই শোকমথিত চোখের জলে সিক্ত ভূমি।

মাটির টানে নয়, পেটের দায়ে দয়ানন্দ চাষবাসে ফিরে গেলো, আর, স্বজনের কানে কানে জ্বালা নিবারণের মন্ত্র প্রচার করতে লাগলো।

চন্দনা একদিন বললে, কম্‌লা, এক বিয়েতে বাপের-বাড়ি থেকে ডাক এসেছে। দিন কয়েক তোমাকে একা না ফেলে রেখে আর পিতাজীর ভার না দিয়ে উপায় নেই। কষ্ট হবে না তো? পিতাজীর ভার বেশি নয়, কেবল কান খাড়া ক'রে অলক্ষ্যে বারদুয়ারীর কাছে কাছে থাকা।

তা পারবো চন্দন, আর, তোমার হাত এড়িয়ে দুপুরে আরাম ক'রে দিবানিদ্রা দেবো। তোমার জ্বালায় তো ঘুমোবার যো নেই, কুস্তি লড়ার যা ক্লান্তি! যাচ্চো কবে?

আজই রাত্রে। ফিরবো শীঘ্রই। সেখানে সকলে জানে এ-বাড়ি ছেড়ে আমি থাকতে পারিনে। যাচ্চি বটে, কিন্তু অকারণে মনটা খারাপ হয়ে গেছে। মনে হচ্চে, যা ছেড়ে যাচ্চি তাতে আর ফিরবো না।

কয়েকদিন পরে এক রাত্রে তিনতলার মহীশূরী ধূপের গন্ধ চার তলায় ভেসে এলো। কমলা বুঝলে সেটা পদ্মার বিশিষ্ট সৌরভ,

পদ্মা ফিরে এসেছে। কস্তুরী ধূপ এ-বাড়িতে কেবল সেই জ্বালায়। কিন্তু দোতলায় বারদুয়ারীর পাশে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকা, তার পদ্মার সঙ্গে দেখা করার কথা মনেও হলো না। অলক্ষ্যে হলেও ভবানীশঙ্করের সেবার ভার পেয়ে কমলা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু সেবা ওই পর্যন্তই, সচেতন থাকা। চন্দনা শ্বশুরের কি সেবা করে কমলা বুঝতে পারলে না। মানুষটির কোনো হুকুম নেই এক কল্‌কে পালটানো ছাড়া, তাও চাকরে ক্ষণ বুঝে ক'রে যায়। হুকুমের অবসরটা কম।

মুখ বুজিয়ে নির্জনে বাস করবার মতো কমলার মনের গড়ন, তবুও এ-ধরনের মানুষও মাঝে মাঝে অন্য লোকের সঙ্গ কামনা করে। চন্দনা থাকতে তাকে কখনো দীর্ঘকালের জন্য নির্জনে থাকতে হয়নি, তার সঙ্গটাও ছিলো আনন্দের। ভবানীশঙ্কর তাকে ডাকতেন, কিন্তু যখন-তখন নয়, প্রত্যহ নয়। পদ্মার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিলো না, তবুও তার কথা মনে হলে কমলার কথা কয়ে আসবার ইচ্ছা হতো কিন্তু সে নিজেকে বলতো, আজ থাক, অন্য এক দিন। পদ্মাও এ কুড়ি-পঁচিশ দিনে কমলার কোনো খোঁজ করেনি। চিরদিনের মতো সে নিজেকে নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকতো।

একদিন ভবানীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, কুস্তি কেমন লড়ছো বেটি? তিনি মৃদু হাসলেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছি ব'লেই এই জিজ্ঞাসা।

কমলাও হাসলো, উত্তর দিলে, কেমন তা আমি বিচার করতে পারি না, কিন্তু বেশ লাগে লড়তে।

কি দাঁও শিখলে তুমি ? বলো, লজ্জা নেই।

কমলা মাথা নিচু ক'রে মুখে হাত চাপা দিলে, মৃদুস্বরে বললে, ঢাক, সখী, গাধালোট—

ভবানীশঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, সাবাশ, গাধালোট শিখেছো ? আশা করি এর পর আর কোনো গাধা তোমার কিছু করতে পারবে না। গর্দভ শাসন করার অমন চমৎকার দাওয়াই আর নেই। কিন্তু আমি যদি তোমাকে পরীক্ষা করতে চাই ?

কমলা মাথা তুলিয়ে উজ্জ্বল চোখে বললে, পরীক্ষা দিতে পারি পিতাজী।

কমলার শেখার অসীম আগ্রহ ছিলো। ছ'মাসে সে শিখেও ছিলো বেশ। পরদিন প্রাতে সে ও পিয়ারী মণ্ডপে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভবানীশঙ্কর এলেন, ওরাও এলো আড়াল থেকে। কমলার মাথায় আঁট ক'রে রুমাল বাঁধা, বক্ষে মোটা পুরু কাপড়ের চোলি, কটিতে মজবুৎ দড়ির পাড় দেওয়া জাঙিয়া। প্রতি পদক্ষেপে তার নগ্ন পুষ্ট ঊরুর পেশী উচ্ছল হয়ে উঠতে লাগলো।

তাকে দেখে ভবানীশঙ্কর বললেন, দেহ তোমার তৈরি হয়েছে বেটি, শক্তির দাগ লেগেছে গলায় গায়ে। এ শঙ্খিনীর নয়, মরদানগীর কণ্ঠরেখা, যা সকল পুরুষের গায়ে থাকে না।

কমলা পঁয়তারার সতর্ক চতুর পদক্ষেপ করতে করতে হঠাৎ পিয়ারীর বাহু ধ'রে গায়ে গা দিলে এবং চক্ষের নিমেষে নিজের কটিদেশ ঘুরিয়ে নিচু হয়ে ঢাক প্রয়োগ করলে। পিয়ারী মাটিতে পড়ে গেলো। ভবানীশঙ্কর হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলেন। একটু পরে প্রকৃত সংগ্রামে তাদের দুজনের দম ফুলতে লাগলো।

শেষ হতে ভবানীশঙ্কর পিয়ারীকে বললেন, বেশ শিখিয়েছো তুমি। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেও।

পিয়ারী একশো টাকা বকশিশ নিয়ে গেলো।

কয়েকদিন পূর্বে কমলা দেবীচৌধুরাণীর হিন্দি অনুবাদটা ভবানী-শঙ্করকে দিয়েছিলো। তিনি চমৎকৃত হয়ে সে গল্পটা পড়েছিলেন। সেদিন কমলাকে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এটি আমার বেটির বকশিশ, অনুবাদের, আর, আমাকে খুশি করার। সময় অনুকূল হলে তোমার অনুবাদটা দরকার মতো শোধন ক'রে বই ছাপিয়ে দেবো, কি বলো ?

কমলা হৃষ্টচিত্তে সে পারিতোষিক গ্রহণ করলে।

ভবানীশঙ্কর মাঝে মাঝে তাকে ডাকতেন না, নীরবতায় ডুব দিতেন। কমলা তার কারণ জানতো না, চন্দনা জানতো। সেটা তাঁর চুপ ক'রে থাকার কাল। এই কালের মধ্যেই একদিন কমলার তাড়াতাড়ি ডাক এলো। সে ঘরে গিয়ে দেখলে ভবানীশঙ্কর বারান্দায় ব'সে। তাঁর একটা টিয়াপাখি ছিলো; তিনি নিজে

সেটার সেবা করতেন। পাখিটা তাঁর ঘরে ঘুরে বেড়াতো, তাঁর ডাকে কাছে আসতো, হুকুমে খাঁচায় ফিরে যেতো।

ভবানীশঙ্করের সমুখে খোলা খাঁচা, তাঁর হাতে নরম কাপড়ের উপর অচৈতন্য এলিয়ে পড়া পাখিটা। তিনি ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেটার পানে চেয়ে আছেন। কমলাকে দেখে মৃতুস্বরে বললেন, দেখো তো বেটি, এ কি আর বাঁচবে ব'লে মনে হয়? আমি বুঝতে পারছিনে। আমার দীর্ঘকালের বন্ধু এ। অচৈতন্য পাখিটার অতি মৃদু শ্বাস বইছে। তুজনে ওরা নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। ভবানীশঙ্করের হাতের শয্যা নিথর স্থির। তুপুর কেটে বেলা গড়িয়ে গোধূলি এলো। রক্তিম আকাশ, মাটিতে ছায়া ফেলে পাখির দল ফিরে চলেছে নীড়ে কলকাকলি জাগিয়ে। একদল টিয়াও ডাক দিতে দিতে প্রখর গতিতে উড়ে গেলো। সে-ডাকে ভবানীশঙ্করের হাতের নিথর পাখি হঠাৎ ডানা ঝটপটিয়ে উঠে দাঁড়ালো, সাড়া দিলে আকাশ পানে মুখ তুলে। আবার নিথর হয়ে পড়লো। আবার গেলো পাখির ঝাঁক ডাক দিয়ে। আকাশের ডাকে, যেন নির্বাণের ডাকে, আবার হাতের পাখি ডানা মেলিয়ে ডেকে উঠলো, কতো কী যে ব'লে গেলো পাখির ভাষায়, তার অন্তিম আবেদনে! পরক্ষণেই এলিয়ে পড়লো নিস্পন্দ হয়ে। ভবানীশঙ্করের নিমীলিত চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কমলা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তাঁর স্নেহ-শোকমথিত বেদনাতুর মুখের দিকে।

আজ চারতলা ও তেতলায় কোনো শব্দ নেই! সুদূর একতলা থেকে মাঝে মাঝে সংসারের ঘুমিয়ে পড়ার আগের সাড়া ভেসে আসছে, আর অবিরাম ভেসে আসছে ঝিঁঝির ডাক, যে-ডাক নীরবতাকে আরো নিবিড়, অন্ধকারকে আরো গভীর ক'রে একলা মানুষকে অসহায় ক'রে তোলে। রাত্রি গভীর হয়ে এলো, কমলার চোখে ঘুম নেই। সে জানতো নিশাচরী পদ্মাও তখনো জেগে আছে। বন্য পশুর মতো তার নিদ্রার কাল দিবাভাগে। তবুও কমলা বারান্দার রেলিঙে দেহ ঝুঁকিয়ে দেখে নিলে, পদ্মার ঘরে আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে জলসার স্থানের আলোর মতো। সে তেতলায় নেমে গেলো। দরজার বাইরে থেকে সাড়া দিলে, পদ্মা বহন্, আমি কমলা। আসবো একটু?

সাড়া এলো, এসো।

দরজা খুলতে বারান্দাটা প্রখর বিজলী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেলো। পদ্মা ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে। অঙ্গে তার সল্‌ওয়ার কুর্তা,

পায়ে জরিদার চটি, হাতে অর্ধেক অবাঁধা কেশ। ঘাড় কাৎ ক'রে একটু আগে সে সন্ধ্যার বেণী খুলে নূতন বেণীসাধনা করছিলো। কমলার আগমনে তার আঙুল থেমে গেছে কিন্তু দেহভঙ্গী বদলায়নি। কমলা চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, একা থাকতে পারছিলুম না ভাই এলুম।

পদ্মা শুধু বললে, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বসো। সে বেণী রচনায় ফিরে গেলো। তার পিঠের কোর্তার বেনারসী জরীর ফুলগুলো দেহান্দোলনে নানাভাবে চকমক করতে লাগলো।

পদ্মা কথা কয়না। কমলা মিনিট দুই আরশির ভিতর দিয়ে তার উজ্জ্বল সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে কাটালে কিন্তু অযাচিত অতিথি ব'লে তার নীরবতায় হাঁফিয়ে উঠলো। কমলা কথা কওয়ার ভূমিকা হিসাবে বললে, আমাদের ধরনে চুল বাঁধবে পদ্মা? ও-পঞ্জাবী পেটো-পাড়া চুল তোমাকে মানাচ্ছে না।

বেণী হাতে পদ্মা ঘুরে দাঁড়ালো, বললে, তোমার মতো বাঁধা? আমার পছন্দ হয়না।

কমলা উত্তর দিলে, আমার এ তো প্রসাধনের বাঁধা নয়! সে কেশ রচনা আলাদা—নেপোলিয়ন, অ্যালবর্ট, বেণে-খোঁপা, পাতাবাহার আরো কতো কি। আমি সব জানিওনে। তার সঙ্গে যদি শাড়ি পরো, তুমি হূরী পরী হয়ে যাবে। সে হাসলো।

কমলার কথায় পদ্মা তার দিকে সমুখ ফিরে মাটিতে ব'সে চুল এলিয়ে দিলে। হেনার সৌরভ মুক্তি পেলো বেণীবন্ধন থেকে।

কারুকার্য করবার মতো কমলা পদ্মার মাথায় পাতা কাটতে লাগলো একটি একটি ক'রে। পদ্মা কথা কইলে না, স্থির দৃষ্টি দিয়ে কমলাকে দেখতে লাগলো। তারপর তার পুষ্ট নিটোল বাহু স্পর্শ করলে, তার বুকে করপল্লব রাখলে, সে-বুক কঠিন। হঠাৎ ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, কম্‌লা, তুমি কি ক'রে এতো অল্প দিনে এমন সুন্দর হয়ে উঠলে ?

কমলা হেসে বললে, ভগবান জানেন। এইবার শাড়ি প'রে এসো।

পদ্মা অনেকক্ষণ ধ'রে নিজের নূতন মুখ দেখলে। পাতা-ঘেরা মুখ যেন সাত ভাই চম্পার বোন পারুলের। চোখ তার একটু একটু ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কমলাকে বললে, এসো আমার সঙ্গে, শাড়ি বেছে দেবে।

তারা পাশের ঘরটায় গেলো। ঘর নয় যেন সাজানো দোকান। পদ্মার বস্ত্রসম্ভার মানুষকে বিস্মিত করবার মতো। অন্ততঃ দুশোটা বেনারসী শাড়ি সাজানো, অন্য সবের সংখ্যা নেই। শাড়ি জামা বেছে নিয়ে তারা আবার এ-ঘরে ফিরে এলো।

পদ্মার দৃষ্টি কমলার সর্বাঙ্গে জুড়ে ছিলো। কি ভাবছিলো সে কে জানে! তার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখেই পদ্মা নিজেকে উলঙ্গ করলে। অপরূপ! কমলা চমকে উঠলো। হঠাৎ পদ্মা পিছন পানে ছুটে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি দিলে। ফিরে এসে বললে, কাপড় ফেলে দাও কম্‌লা। তোমাকে দেখবো কেমন রূপসী তুমি। রূপ কেবল তোমার মুখের, না সারা দেহেরও।

কমলা তার স্বরের ধরন না বুঝতে পেরে খেলা ভেবে বললে, সে আর কি বেশি কথা ! দেখো।

সে বসনমুক্ত হতে লাগলো। আবার পদ্মা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা শিশি হাতে নিয়ে ফিরে এলো। কমলার অঙ্গে তখনো আধোবাস। পদ্মা চোখ কুঞ্চিত ক'রে বললে, দেখবো তুমি কি। আমার প্রতি অঙ্গের সঙ্গে তোমার প্রতি অঙ্গ তুলনা ক'রে দেখবো। এ বাড়িতে কেন, আমার দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরীর স্থান নেই, স্থান হবেনা। তুমি জেতো, আমার হাতে এই তেজাব—অ্যাসিডের শিশি ; এ দিয়ে তোমার সুন্দর অঙ্গকে পুড়িয়ে তোমাকে অন্ধ ক'রে দেবো। আমি জিতি, তুমি বেঁচে যাবে, তোমাকে দয়া করবো।

হঠাৎ বিস্ময়ে ভয়ে কমলার হাত থেমে গিয়েছলো। পদ্মা চিৎকার ক'রে বললে, খোল বলছি। চোখে তার আগুন।

কমলার ঢিলা সায়া আপনি খুলে পড়লো। পদ্মাও স্বীকার করলে, অপরূপ ! তার চোয়াল কঠিন হয়ে উঠলো। কমলা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে পদ্মার হাত-পায়ে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে পাষাণ মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে পদবিক্ষেপ দিয়ে আততায়ীর গতি নির্ণয় করবার তথ্যটুকু পিয়ারীর কাছে শিক্ষা করেছিলো। কিন্তু পদ্মার হাতে মারাত্মক অ্যাসিড, কমলা তার সে হাতটার উপর লক্ষ্য না রেখে পারলে না। পদ্মা তখন বারবার কমলার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বোলাচ্ছে, তার মুখ চোখ হিংসায় আরক্তিম,

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, বুক দ্রুতশ্বাসে উদ্বেল। বাঘিনী হলে তখন তার জিহ্বা লেলিহান, নখর কোষমুক্ত হতো, আস্ফালন জেগে উঠতো তার লাঙ্গুলে। পদ্মা অদ্ভুত স্বরে ব'লে উঠলো, কাল সকালে তোমার এ-রূপ আর থাকবে না। সে পরাজয় মানলো। তাঁর বাঁ হাতটা শিশির ছিপির পানে গেলো, ডান হাত একটু বাঁ দিকে সরে গেলো।

কমলা অত্যুগ্র আগ্রহে পদ্মার হস্তভঙ্গি পরিবর্তনের অপেক্ষা করছিলো। তার দক্ষিণ বাহু একটু সরতেই সে বিদ্যুদ্বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মার মণিবন্ধ উলটো ক'রে মুচড়ে ধরলে। শিশিটা মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেলো, আর সে চূর্ণ কাচ ও অ্যাসিড গালিচার উপর ছড়িয়ে পড়লো। কমলা পূর্ব নিমেষেই পদ্মাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলো। বেদনায় পদ্মা কাতর শব্দ ক'রে উঠলো। ঘরে যবক্ষারের ধোঁয়া আর পোড়া গালিচার তীব্রগন্ধ। পদ্মা বাধা পেয়ে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। সে তখন আরশিটার সামনে দাঁড়িয়ে। চক্ষের নিমেষে আরশির তাক থেকে সে ছোটো একটা ছোরার মতো তুলে নিলে। কমলা আগে এক-দিন সে বস্তুটার তারিফ করেছিলো। কাগজ কাটার মতো ভোঁতা ছুরি সেটা কিন্তু তার প্রান্তটা ছুঁচালো তীক্ষ্ণ। সে প্রশংসা করেছিলো সেটার মণি-খচিত বাঁটের।

কমলা তখন নির্ভয়। সে অক্লেশে আবার পদ্মার হাত মুচড়ে ধরলে। ছুরিটা ঝনঝনিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সে সেটাকে

চকিতে কুড়িয়ে নিয়ে দূরে পদ্মার বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলে। পদ্মা তখন ব্যাহত ব্যাঘ্রীর মতো কমলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুক কামড়ে ধরলে। বেদনায় কমলা চিৎকার করে উঠলো প্রথমে, তারপর পদ্মার নাসা টিপে ধরলে। দুটি রক্তাক্ত অর্ধচন্দ্রাকার দাঁতের রেখা তার বুকে রয়ে গেলো। পদ্মাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে নিজের কাপড়টা তুলে নিয়ে কমলা পালালো।

চন্দনা ফিরে এলো দু'দিন পরে। কমলা কিন্তু এ-ঘটনাটা তার কাছে গোপন রাখলে।

কমলার মুখে টিয়াপাখিটার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চন্দনা চমকে উঠলো। সেই কেবল উপলব্ধি করতে পারলে সেই ক্ষুদ্র জীবটার মৃত্যুতে ভবানীশঙ্করের কতোখানি গিয়েছে। পরক্ষণেই তার মনে হলো, এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত সে মৃত্যু দেখেনি, শোক দেখেনি। এখন মৃত্যু এলো কেন? এলো কোন ভবিষ্যতের সূচনা নিয়ে? সব মৃত্যুই পরিবর্তনের সূচনা, কী পরিবর্তন আসবে আগামী দিনে? চন্দনা বেশি ভাবতে পারেনা, তবুও কিছুদিন থেকে তার মনে আগামী কালের ছায়াপাত হয়েছিলো যেন। সে-ছায়া অমঙ্গলের।

সকল মানুষেরই মনে একটি চঞ্চলচিত্ত চির-বালক লুকিয়ে থাকে। সেই অদেখা বালকটিই তাদের সঞ্জীবিত ক'রে রাখে, জীর্ণ হতে দেয় না, বড়ো ক্ষতি থেকেও সামলে তোলে। চন্দনা জানতো, তোতাটা ছিলো তার শ্বশুরের বালকত্বের প্রতীক। ছেলেবেলার খেলায়, অর্থহীন ভাষায় সেই পাখিটাই তাঁকে নামিয়ে আনতো।

সারারাত্রি সে ভবানীশঙ্করকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো।
পরদিন দেখলে তার অনুমান সত্য, ভবানীশঙ্করের চোখের কোণে
এতোকাল পরে সেই তোতাটারই পদচিহ্ন কুঞ্চনে আঁকা হয়ে
গেছে। কপালের বলিরেখায় আর আগেকার দ্যুতি নেই, তাতেও
যেন মলিন ছায়া নেমে এসেছে। চন্দনা পাখিটার কথা
আলোচনায় আনলো না, আগের মতো হাসিমুখে তাঁকে তার
পিত্রালয়ের গল্প শুনিয়ে এলো। ভবানীশঙ্করের মুখেও প্রসন্ন হাসি
ফুটে উঠলো তাঁর এই অত্যন্ত প্রিয় পুত্রবধূটিকে দেখে।

কমলা তার পরীক্ষা আর পারিতোষিকের কথা চন্দনাকে জানালে।
চন্দনা বললে, আমার পারিতোষিক দেখবে কম্‌লা? এসো দেখাই।
চন্দনা একটা দেরাজ খুললে। ওঁর দেওয়া এই আমার উপহারের
সম্ভার, যার মূল্য নেই। কর্পূরের মালা, মুক্তা-চন্দনে গাঁথা
কণ্ঠহার। গজদন্ত খচিত হাতির গায়ে সোনার তারের বিদরী
কাজের মতো সূক্ষ্ম পেশীরেখা টানা, গজদন্তেরই সজীব কৃষ্ণমূর্ত্তি,
দেখলে মনে হয় তার সুবর্ণ মুরলী এই বেজে উঠলো, তার চোখের
হাসি এখনি মায়া ছড়াবে। কমলা বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে
লাগলো, কল্পনার অতীত সৌন্দর্য সে-সকল বস্তুর। চন্দনা বললে,
টাকা আমি নিইনে, তা উনি জানেন!

চন্দনার ঘরে পদ্‌মার সঙ্গে কমলার নিত্য দেখা হতে থাকলো।
এখন সে পদ্‌মার দৃষ্টির আগুনের উত্তাপ অনুভব করতে পারতো,
তার চোয়ালের পিষ্টপেশীর দ্রুত বয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো

ঢেউয়ের অর্থও বুঝতো। কিন্তু কমলার মনে এই আশ্চর্য রমণীটির প্রতি বিন্দুমাত্র বিরাগ ছিলো না। পদ্মা তাকে ডাকলে আবার কমলা তার ঘরে যেতে পারতো। কিন্তু পদ্মা আর কোনোদিন তার সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি।

দিন যায়। আগেকার বাঁধা নিয়মে এ-সংসার চলে। চন্দন আগেকার মতোই হারিয়ে থাকে সংসারের দৈনন্দিন নানা কর্মে। পদ্মার দুনিয়ারও সেই একই রূপ—প্রসাধন, আত্মসোহাগ, আপনাতে আপনি মেতে থাকা। গঙ্গার তীরে প্রভাতে সেই প্রতিদিনের ভান্তর পূজারী। কমলা লেখে পড়ে ভাবে, তবুও তার মনে অবর্ণনীয় একটা স্তব্ধতা শূন্যতার উপলব্ধি। তবুও দিন চলে যায় দ্রুততালে। কেবল পৃথিবীব্যাপী রণনির্ঘোষ যুদ্ধাতঙ্ক এ-অন্তঃপুরেও মাঝে মাঝে ভেসে আসে।

সতীশ এলো হঠাৎ। আগেকার মতো হাসিমুখে চঞ্চল পায়ে একা এলো না, তাকে তার কয়েকজন সঙ্গী বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলো। ভবানীশঙ্কর দেখলেন, সতীশের মা দেখলেন, চন্দনা দেখলো, সতীশের উদাস দৃষ্টি, তার চেতনা থাকলেও সে বিমূঢ়। হাতে তার পাথরের খণ্ড একটা আর হাতুড়ি বাটালি। সে আপন মনে অতি সন্তর্পণে পাথরে বাটালির কোমল আঘাত করছে, ঠুক ঠুক ঠুক।

ভবানীশঙ্করের দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সতীশের মা অপলক দৃষ্টিতে তার পানে চেয়েছিলেন হঠাৎ তার হৃৎপিণ্ডটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সে-বেদনা জানলো না আর কেউ। মায়ের বেদনা

নীরব, তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। চন্দনা কাঁদলো। সে সতীশকে বুকে জড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এলো, তখনো তার হাতে পাথর-বাটালি। চন্দনার আজ দীর্ঘদিনের পর মনে পড়লো, একদা তাঁর একটি অন্ধ সন্তান জন্মেছিলো। সেই একদিন কেবল ভবানীশঙ্করের দীর্ঘশ্বাস পড়েছিলো। সন্তানের অন্ধত্বের কারণ সংস্কারবশে তার পিতার কলুষিত দেহতে নিহিত মনে ক'রে চন্দনা সে অন্ধ অপরিণতদেহ সন্তানের একাগ্র চিত্তে মৃত্যু কামনা করেছিলো, আর তার মৃত্যুর পর মুক্তির শ্বাস ফেলে শিশু সতীশকে নিজের সন্তানজ্ঞানে বুকে তুলে নিয়ে তারই মধ্যে নিজের সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা নির্ভরতা অর্পণ করেছিলো। কালে সতীশই হয়েছিলো তার সহজ সন্তান। সন্তান কামনায় অথবা বিলাসের আশায় আর কোনোদিন চন্দনা তার স্বামীকে নিজের দেহ দেয়নি। তার সকল সন্তান কামনা মাখানো ছিলো সতীশের সত্তায়।

সতীশ ঘরের মেঝেয় উবু হয়ে ব'সে আবার পাথরে বাটালির আঘাত করতে লাগলো, ঠুক ঠুক ঠুক। চন্দনা দুঃখ শোকে স্তব্ধ হয়ে এই নূতন শোকাবহ তক্ষনশিল্পীর শিল্পরচনা দেখতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর সতীশ ক্ষতবিক্ষত পাথরটুকু চন্দনার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দেখো তো ভাবীজী, কমলার চোখের মতো হলো কি না? আঃ কতোকাল যে সে-চোখ খুঁজছি! এই ধরি ধরি, কিন্তু ধরা পড়ে না। ভাবীজী, আগে কমলার চোখ গড়বো, তারপর

তার মুখ, অবশেষে গড়বো তার দেহ। অষ্টম শতাব্দীতে আরম্ভ করেছি, থামবো সম্পূর্ণ করবো এসে সেই বিংশ শতাব্দীতে। কালের গতিতে আমিও এগিয়ে চলেছি পাথর থেকে মানুষে, নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণে, বিমূর্তি থেকে মূর্তিতে, ঈশ্বর থেকে প্রাণের সাড়ায়! সতীশের সঙ্গে কমলার এ অভাবনীয় অদ্ভুত যোগ লক্ষ্য ক'রে চন্দনার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠলো। সতীশের বালক-হৃদয় ভুবনমোহিনী এই পূর্ণ যুবতীটিকে গ্রহণ করতে গিয়ে বিলোপের কম্পনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। চন্দনা হৃদয়ের তন্তুটানা বিমর্দিত বেদনায় খাটে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদলো। অনেকক্ষণ পরে তার চেতনায় সাড়া এলো, ঠুক ঠুক ঠুক। সে চোখ মুছে উঠে বসলো, প্রতিজ্ঞা করলে, আর কাঁদবে না, সহায় দিতে গেলে কান্নার স্থান নেই তার জীবনে।

পুরনো এই বাড়িটার গায়ে কালের বাতাবর্তের নানা চিহ্ন লেখা। কিন্তু তার অন্তরে বিগত কালের ঝড়ঝঞ্ঝা কোনো লেখা রেখে যায়নি। বংশের পর বংশে মানুষ সেখানে পরিক্রমণ ক'রে গেছে। হাসা কাঁদা, জীবন মৃত্যু, আনন্দ শোক দিয়ে তৈরি কালের চাকা ঘুরেছে বাড়িটার ভিতর। স্থায়ী হয়ে আনন্দ বা শোক কোথাও থাকেনা, এখানেও থাকেনি। চন্দনার কিন্তু সতীশের উপর দৃষ্টি রেখে মনে হলো, এই বাতুলতার নিদারুণ অসহ্য শোক যেন থেমে আছে আবহমান কাল ধ'রে, এই বাতুলতা কালজয়ী, চিরদিনের বাসা বেঁধে আছে এই বাড়িটায়।

হঠাৎ তার মনে পড়লো, কম্‌লাকে দেখলে হয়তো সতীশের ঘোর কেটে যাবে। সে কমলাকে ডেকে আনলে। সতীশকে দেখেই কমলার বুক দুরুদুরু ক'রে উঠলো। সতীশ তার দিকে মুখ তুলে চাইলে বাটালি থামিয়ে। চন্দনা জিজ্ঞাসা করলে, একে চেনো সতীশ? এই তো কম্‌লা!

একদৃষ্টে কমলাকে দেখে সতীশ মাথা দুলিয়ে বললে, চিনি। সেই সুদূরের কম্‌লা, সেই বিংশ শতাব্দীর। ওর দিকেই চলেছি পাবো ব'লে। এখনো পাওয়া হয়নি, পেতে দেরি আছে, দেরি হবে। তিলতিল ক'রে, জন্মজন্মান্তরের সাধনা না হলে তিলোত্তমা কম্‌লাকে পাওয়া যায়না ভাবীজী। আমি সে-কথা ভালো ক'রেই ভেবে রেখেছি। সে মাথা নিচু ক'রে পাথর কাটতে লাগলো, ঠুক ঠুক ঠুক।

কমলা দুঃসহ লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলে, নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলে নারী হয়ে জন্মানোর জন্যে। বিধাতাকে সে অভিশাপ দিলে, নারী ক'রে যদি পাঠালে কেন ভ্রষ্টকরা ধ্বংসকরা নারী ক'রে আমায় গড়লে তুমি? কুরুক্ষেত্র ট্রয়ের সাধ এখনো কেন মিটলো না তোমার? ও সতীশ নয়, কুরুক্ষেত্রের আগুনের আহুতি। বিধাতার মুখের কালি লেপে দেওয়া লজ্জা!

সতীশ দাঁড়িয়ে উঠে পাথরটা কমলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, দেখো তো কম্‌লাজী, কম্‌লার চোখ হয়েছে? তোমার চোখের প্রাণবস্তু ওতে দাওনা কম্‌লাজী! ধরতে পারছিনে আমি সেটাকে।

সে হঠাৎ কমলার ডান চোখে হাত রেখে ব'লে উঠলো, দাঁড়াও, দৃষ্টি তোমার মনে আছে, কিন্তু তোমার চোখের রেখা ভুলে গেছি। আমার আঙুলে মাখিয়ে নিই সে-রেখার অনুভূতি।
কমলার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো। চন্দনা কাঁদবে না প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সে অশ্রুভরা চোখে চেয়ে মুখে কাপড় গুঁজে দিলে। সতীশ বর্ণহীন হাসি হেসে বললে, তোমার এ-চোখ দিয়ে সেই হাসির দৃষ্টি ভুলিয়ে দিয়ো না কমলাজী! তাহলে পাগল হয়ে যাবো।
কমলা ফুঁপিয়ে উঠে মাথা নিচু করলে, পরক্ষণেই মাথা তুললে। তার চোখে কান্নাভরা হাসি।
চন্দনা টলতে টলতে অচৈতন্য হয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলো। কিন্তু বাটালির শান্ত শব্দ আবার জেগে উঠলো, ঠুক ঠুক ঠুক।

হাকিম বৈদ্য ডাক্তার সাইকো-অ্যানালিষ্ট এলো গেলো কিন্তু এ-বাড়িটায় সেই অবিশ্রাম ঠুক ঠুক শব্দ আর বন্ধ হলো না।

একদা যুদ্ধের বিপুল নির্ঘোষ ছাপিয়ে দুর্ভাগার বাংলাদেশে গভীর আর্তনাদ উঠলো। বৃদ্ধ যুবক নারী শিশুর মিলিত আর্তস্বরের এমন মরণ-অর্কেস্ট্রা পৃথিবীর কোনো সভ্যতাভিমানী দেশে কোনো কালে বাজেনি। নিশ্চিত মরণ বুকে নিয়ে বাঁচবার আশার কাঁদন সে-আর্তনাদকে ভয়াবহ ক'রে তুললে। মরণাশ্রু জমে গিয়ে মেঘাকারে ছেয়ে দিলে আকাশ।

এই সেই ভারতবর্ষ যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র একটিমাত্র প্রজার অকালমৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলো। এই সেই দেশ যেখানে গৃহিণীরা অতিথির অপেক্ষায় দিনান্ত পর্যন্ত অভুক্ত থাকতো, রাত্রের অতিথির আশায় যারা অন্ন রেখে দিতো সযত্নে।

আর, এ-ভারতবর্ষও সেই যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অকাল-মৃত্যুতেও রাজা নিস্পৃহচিত্ত, মরণাপন্নের প্রতিবেশী অসাড়, বুভুক্ষুর মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া গ্রাস যেখানে অপরিমেয় বিত্তের

সৌধ গড়ে। মৃত্যুর শেষ নিশ্বাস সর্বত্র কিন্তু তা দিয়ে বেষ্টিত হয়েও যেখানে সিনেমা-হলে আর খেলার মাঠে আমোদীর ভীড় রতি-প্রমাণও কমে না।

যাদের দেবার মতো কিছু নেই, সংসারে যারা নিত্য অভাবে বিপন্ন কিন্তু মমতাবোধ আছে যাদের তারা খুদকুঁড়ো নিয়ে ছুটলো এই বিশাল মৃত্যুসাগরে বাঁধ দিতে। এলাহাবাদের 'লীডর' পত্রিকা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপন করলে। তা দেখে কমলা খবর না দিয়েই ভবানীশঙ্করের কাছে গেলো। তিনি পড়ছিলেন, চশমা নামিয়ে প্রসন্নমুখে বললেন, আসন রক্‌খো বেটি। এমনি ক'রে যদি আসো খুশি হই। সকল সময়ে পড়তে ভালো লাগে না। কিন্তু তোমার মুখ অতো গম্ভীর কেন কম্‌লা?

কমলা তার পারিতোষিকের টাকাটা তাঁর পায়ের কাছে রেখে বললে, এটা 'লীডর ফণ্ডে' পাঠিয়ে দিন। আমার তো সোজাসুজি পাঠাবার উপায় নেই!

বালিশের তলা থেকে ভবানীশঙ্কর চেক-বই বার করলেন। লিখলেন একটা হাজার আর একটা পঞ্চাশ টাকার চেক। কমলা চেয়ে দেখলে, তিনিও মুখ তুললেন। দুজনের দৃষ্টি মিলে গেলো।

ভবানীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চোখে প্রশ্ন কেন মা? ওই পঞ্চাশ টাকার জন্য? ওটা অনিচ্ছায় তোমার খাতিরে আমার মুখরক্ষা করবার জন্য দেওয়া। তুমি না এলে দিতুম না, একটি কপর্দকও দিতুম না। দেবার কথা আমার মনেও হয়নি।

চাকর তামাক দিয়ে তাঁর চেকভরা চিঠি নিয়ে গেলো। ফরসির নল উঠলো ভবানীশঙ্করের মুখে। কমলা তাঁর ভাব না বুঝতে পেরে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

কেন দিতুম না জানো বেটি? এ-দেওয়া পাপ, তাই দিতে নেই। আজ দেড়শো বছরের উপর হলো বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষের অবিচ্ছিন্ন ধারা এ-দেশে বয়ে চলেছে। রাজায় পারে কিন্তু এ-দেশের রাজা তার কারণ নির্মূল করবার জন্য কোনোদিন কোনো সত্য ব্যাপক প্রয়াস করেনি। দয়াপরবশ মানুষ যা দেয় তা দিয়ে বন্যা থামে না, মহামারী বন্ধ হয় না, বারোমেসে কায়েমী দুর্ভিক্ষ নির্মূল হওয়া দূরে থাক ক্রমশঃ সমাজের সকল স্তরে সেটা নানা আকারে ব্যাপ্ত হয়ে চলে। দেশজোড়া বিষাদ, করুণ হাসির মুখোশের নিচে কি আর কিছু দেখতে পাও না কমলা? আমার সমস্ত বিত্ত দিলেও আজ বাংলার সমগ্র নিপীড়িতের এক বেলারও ভরপেট অন্ন হবে না। দু'কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারলেও তা দিয়ে এ-মৃত্যুস্রোতে বাঁধ দিতে পারবে না বেটি! তাই আমি দুর্ভিক্ষকে মহামারীকে বন্যাকে বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখতে একটি পয়সাও কখনো দিইনি। তোমাদের বিবেকানন্দজী দরিদ্রনারায়ণকে পুষতে বলেছেন। আমি বলতে পারলে বলতুম, এই অমোঘ মৃত্যু বুকে নিয়ে এরা শেষ সাড়া দিয়ে ধ্বংস ক'রে, চিরদিনের জন্য সব বিলীন ক'রে দিয়ে যাক। সব নারায়ণকে ডুবিয়ে দিয়ে শক্তিনারায়ণের আরাধনা করো বেটি।

ভবানীশঙ্করের আবেগশূন্য মুখ, উত্তাপশূন্য কথা, কিন্তু তাঁর কথায় কমলা উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

কি করলে সম্যক উপকার হয় জানো কম্‌লা? বিশ্বনাথের মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে এসো, বিশ্বকল্যাণ আর তাঁর হাতে নেই। অন্নপূর্ণাকে উপড়ে ফেলে গঙ্গায় নিমজ্জিত ক'রে দাও। যেন এই অসহায় দেবতাদের মানুষ আর আকুতি না জানায়, ক্রন্দনের মাঝে আশার দৃষ্টি দিয়ে তাদের মুখ চেয়ে না থাকে, যেন আর দেবতা-সহায়ের মিথ্যা সন্তোষ না খোঁজে। সহায় লোভে আগামী বংশ যেন আর জড় হয়ে না থাকে।

আমার তিন লাখ টাকা আছে। তোমাকে উপযুক্ত মানুষ পেয়েছি, তোমার হাতে দেবো। কিন্তু তা দিয়ে এক কণা তণ্ডুল কিনবে না, বন্যায় ভেসে-যাওয়া একজনকেও তীরে তুলবে না। শুধু সংহারের যন্ত্র কিনো বেটি। আর সে-যন্ত্র ব্যবহার ক'রো ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, রাজার বিরুদ্ধে নয়, যে নিপীড়ক, যে পরাস্বপহারী, যে মনুষ্যত্বকে হীন করেছে তারই বিরুদ্ধে। তাতে শাদা কালা ভেদবুদ্ধি রেখো না।

কমলা তাঁকে নিমীলিত-নয়ন নিঃশব্দ দেখে ধীরে ধীরে চলে গেলো।

ভবানীশঙ্কর নিজে কোনোদিন খবরের কাগজ পড়তেন না, এক পাঠক তাঁর হুকুম মতো পড়ে শোনাতো। সে চুম্বকগুলো পড়ে

যেতো, যেটা শোনবার ইচ্ছা হতো তিনি সেটা শুনতেন। একদিন কিন্তু দূর থেকে তাঁর দুটো ছবির উপর দৃষ্টি পড়লো। কাগজটা কাছে টেনে নিয়ে দেখলেন, একটা ছবি ফুটপাথে ছড়ানো শবের, অন্যটা আঁস্তাকুড়ের দৃশ্য। ক্ষুধায় তার আশেপাশে মানুষ কুকুরে পরিণত হয়ে গেছে। কুকুরের মতো, কাকের মতো আবর্জনার স্তূপে অন্নকণা অনুসন্ধান করছে। বেদনায় উদ্বেল-হৃদয় ভবানী-শঙ্করের বাইবেলের বাক্য মনে পড়ে গেলো: *"And God created man after His own image"*—এই সেই মানুষ!

কয়েকদিন পরে উপর থেকে ভবানীশঙ্করকে অসময়ে ঘাটে দেখে কমলা আশ্চর্য হলো। তাঁর নগ্নপদ, নগ্নদেহ। তাঁর সমুখে জ্বলন্ত উনানের মতো, তাতে একটা মাটির পাত্র চাপানো। তার মন বলতে লাগলো, এ কি হলো, এ কি হলো! সে তাড়াতাড়ি চন্দনাকে ডেকে আনলে। চন্দনা সে-দৃশ্য দেখেই নিচে ছুটলো, কমলাও ছুটলো তার সঙ্গে। ওরা ভবানীশঙ্করের পিছন থেকে দেখলে, পাত্রটায় সামান্য নিরভিমান হবিষ্যান্ন সিদ্ধ হচ্ছে।

পিছনে মানুষের উপস্থিতি অনুভব ক'রে ভবানীশঙ্কর ফিরে চাইলেন। তোমরা চন্দন? মনে হয়েছিলো আসবে। বসো। চন্দনার চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো। ভবানীশঙ্কর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদিসনে বেটি। আমার বুঝতে দেরি হয়েছে যে যে-দেশে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় আঁস্তাকুড় বাছে সে-দেশে সুখের অন্ন মুখে তুলতে নেই। অন্নের তাড়নায় মানুষ

যেখানে সংসার-ভাঙা গৃহহারা, সেখানে ঘরে থাকতে নেই। এতোদিন ভুলে ছিলুম যে গঙ্গাতীরই প্রকৃত গৃহ, হবিষ্যান্নই প্রকৃত অন্ন।

কেউ তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে না। সে সাহস এ-বাড়িতে কারো ছিলো না। বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। কেবল মাঝে মাঝে সতীশের হাতুড়ির শব্দ মুখর হয়ে উঠতো, ঠুক ঠুক ঠুক। কমলা চন্দনা ছায়ার মতো ঘাটে ঘুরতে লাগলো। তারাও ভবানী-শঙ্করের হবিষ্যান্নের পাত্রটার ভার বাড়িয়ে দিলে, তারাই তা সিদ্ধ করতে লাগলো। ভবানীশঙ্কর তা দেখে মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না। আকাশের তলে একবস্ত্রে তাঁর দিন কাটতে লাগলো।

তিনি বিশ্বনাথের মন্দির গুঁড়ো করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রাতের স্তবে জবাকুসুম সঙ্কাশম্ ধ্বনি মুছে গেলো। সংস্কার তাঁর হৃদয়ে দিবারাত্রির মন্ত্র জাগিয়ে তুললে, ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি পুণ্ডরীকাক্ষ।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। নির্বাক ভবানীশঙ্কর একদিন শুধু চন্দনাকে বলেছিলেন, এ আমার সুদূরের মরণাপন্ন বাংলাদেশের জন্য তর্পণ নয় বেটি। আমার ছেলে বৃজবিহারীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত। আমি দেখি তারই উলঙ্গ উন্মত্ত ধনলোভ ওই মানুষগুলোকে আঁস্তাকুড়ে ঠেলে নিয়ে গেছে। বাপের পাপে ছেলের, ছেলের পাপে বাপের প্রায়শ্চিত্ত তো বিশ্বনিয়ম। পাপ

কোনোদিন কাউকে ক্ষমা করে না। সুখের বেশে সে আসে আর দুঃখের বরষায় নামিয়ে দিয়ে যায়। ধ্বংস আসছে, চন্দন, ধ্বংস এলো বৃজবিহারীর পায়ে!

সতীশের মা দূরের দরজা থেকে ম্লানমুখে ঘাটের দিকে অপলক চেয়ে থাকতেন, কাছে আসতেন না। হৃদয়ের বেদনা তাঁর দুঃখের একমাত্র সঙ্গী। বহুকাল আগে স্বামীকে তিনটি সন্তান দিয়ে তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে স্বামী যেদিন দেবতা হয়ে গেলেন, সেদিন হতে তিনি আর ভবানীশঙ্করের কাছে আসেননি।

ছেলেবেলা থেকে কমলা কোনোদিন কাঁদেনি। সে ধ্রুব জানতো কান্না তার অদৃষ্টলিপিতে লেখা নেই। ভবানীশঙ্করের গৃহে এসে প্রথম তার চোখ দিয়ে জল পড়েছিলো।

তার আর খবরের কাগজ পড়বার স্পৃহা ছিলো না। কিন্তু একদিন কি করতে ঘরে গিয়ে সেদিনকার কাগজটায় তার দৃষ্টি পড়লো। দৃষ্টি তুললে যখন তখন তার চোখ ভরা জল গালে উষ্ণ নদী এঁকে গড়িয়ে পড়লো। দয়ানন্দের সদানন্দ মুখ ভেসে উঠলো তার চোখের সুমুখে। পূর্বদিন ফাঁসি হয়ে গেছে তার, কারণ রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, কারণ, জাপানীদের ডাকা, আরো অনেক গুরু অপরাধ। তার মনের পরিবর্তন ও পরিণতির কথা, তার বিচারের কাহিনী কমলা জানতো না, জানলোও না। মনে পড়ে

গেলো তার গান, তার আশ্বাস দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া। কমলা কাঁদলো। তার মনে তীক্ষ্ণ একটা বেদনা লুকিয়ে ছিলো, সেই বেদনাই তাকে কাঁদালো। দয়ানন্দ ভেবেছিলো, কম্‌লা হয়তো একদিন আমার পথে নেমে আসবে। বোধ হয় কমলা তার পথে এগিয়ে গেলো। কিন্তু নিম্ন নামাল মর্ত্যের পথে নয়, ঊর্ধ্বে নীহারিকায়, শোকের শ্বাস যেখানে পুঞ্জীভূত, যার জন্য শোক তার আত্মার যেখানে আশ্রয়।

ভাঙনের ক্লান্ত অবসন্ন দিন যায়। অন্তরীক্ষ্যে ভাগ্যহত সংসারের দূরাদৃষ্ট ঘনিয়ে আসে। একদিন প্রাতে বাড়ি থেকে হঠাৎ বিলাপের কলরোল উঠলো। ভবানীশঙ্কর বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন কেবল, চন্দনা কমলা ছুটে চলে গেলো। ভবানীশঙ্কর কান পেতে শুনলেন, কান্না যেন চন্দনার। বহুকাল এ-বাড়িতে ক্রন্দনধ্বনি ওঠেনি। তাঁর সন্দেহ হলো, চন্দনা কি কাঁদে কখনো? এ-সংসারটা কেবল তার হাসির উচ্ছ্বসিত স্বরই শুনে এসেছে। দীর্ঘকাল পরে ভবানীশঙ্কর বাড়িতে ঢুকলেন।

কান্নার রোলের মাঝেও নিরলস তক্ষণশিল্পীর অস্ত্র পাথরে আঘাত করতে থাকলো, ঠুক ঠুক ঠুক।

ভবানীশঙ্কর গিয়ে দেখলেন, সতীশের মা-র গতপ্রাণ দেহের শিয়রে চন্দনা শোকবিধুর। সে অন্দরে আসবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। সে মৃত্যু হঠাৎ আসেনি, পথ পেতেছিলো বহুদিন ধ'রে, এগিয়ে এসেছিলো সতীশের কারণে, ভবানীশঙ্করের

দুঃখদায়ক কৃচ্ছ্র সাধনায়। সেদিন আকস্মিকভাবে তাঁর হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো। ভবানীশঙ্কর কিছু জানতেন না। স্বভাবগুণে কেন ও কখনের প্রশ্ন তিনি নিজেকে বা আর কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন না। আন্দাজ করলেন, সতীশ তাঁর মায়ের জীবন্ত প্রায়শ্চিত্ত, এ-মৃত্যু সেই প্রায়শ্চিত্ত অন্তের। বহুক্ষণ তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখলেন। অবশেষে পা বাড়িয়ে মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন, সাজিয়ে দিও চন্দন, আর, সময় হলে আমাকে ডেকো। কমলাকে ডাকলেন, আমার সঙ্গে এসো বেটি।

কুঠার হাতে ভবানীশঙ্কর আগামী যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করতে লাগলেন। ম্যাগ্নোলিয়া, অ্যামহার্ষ্টিয়া, ল্যাবরণম্, চন্দনের কাঠ তিনি ও কমলা দুজনে বয়ে আনলেন। চাকরেরা আনলো শুকনো কাঠ, শুকনো ঝাউ। ঘাটের মর্মর চাতালে চিতা সজ্জিত হলো। সেটা ভবানীশঙ্করের পুরুষানুক্রমের পারিবারিক শ্মশান। তারপর তিনি চন্দনা ও কমলা গৃহিণীর স্বল্প লঘু দেহটি বহন ক'রে আনলেন। দূরে নীরব আত্মীয়েরা। ঘাটে এ তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।

অন্ত্যেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হলো। অগ্নিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ভবানী-শঙ্করের উদাত্ত স্বর জেগে উঠলো, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ স্বর্গায়-লোকায় স্বাহা। তপ্যতে স্বাহা। তপ্যমানায় স্বাহা। ধর্মায় স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।

শতকোটিতম বার গঙ্গার কূলে উদার আকাশের তলে অথর্ববেদ

মন্ত্র ধ্বনিত হলো চরম নিবেদনে : সূর্যং চক্ষুষা গচ্ছ বাতমাত্মনা দিবং চ গচ্ছ পৃথিবী চ ধর্মভিঃ। অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধিষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ স্বাহা।

তিনদিন ভবানীশঙ্কর চিতার কাছে বসে রইলেন। জড়পুত্তলির মতো চন্দনা কমলাও রইলো তাঁর কাছে। চতুর্থ দিনে বৃদ্ধ চোখ খুললেন, রক্তকণিকায় ভরা সে দুটি চক্ষু। চন্দনার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'ওর পুত্র নেই চন্দন। শ্রাদ্ধও সম্পন্ন ক'রে আসি আমি। যথাকালে ফিরে আসবো। চন্দনার মাথা তাঁর বুকের কাছে ভেঙে পড়লো।

অরণ্যে রোদন শুদ্ধতম শ্রাদ্ধ, ভবানীশঙ্কর বিন্ধ্যাগিরির অরণ্যে চলে গেলেন।

৮

চন্দনার অপরিসীম শ্রান্তি। তার মূর্তি বিবর্ণ, মলিন মুখে বেশরও মলিন হয়ে গেছে। দেহে তার পূর্বেকার খুশির আনন্দ-উজ্জ্বল ভরাট রূপটি আর নেই। গালে হাড় দেখা দিয়েছে, পুরোবাহুতে তার জেগে উঠেছে শিরার জাল। দৃষ্টি তার বিভ্রান্ত, বিষণ্ণ চোখের নিচে নীল ছায়া। ঝড়ের ঝাপটা লেগেছে তার সর্বাঙ্গে। সে-রাত্রে কমলা তার শিয়রে ব'সে গল্প করছিলো। হঠাৎ সেখানে ব্রজবিহারীর উদয় হলো।

চন্দনা চকিতে উঠে বসলো। সে এই উদয়েরই ভীত অপেক্ষায় ছিলো। বিশেষ ক'রে গৃহিণীর মৃত্যুর পর থেকে তার আর অপেক্ষা সহ্য হচ্ছিলো না। অঘটন আসবেই, তার উত্তান মন নিরন্তর বলছিলো, আসুক তাড়াতাড়ি, যা ঘটবার ঘটে যাক।

ব্রজবিহারী পানমত্ত। একটু ক্ষণ দুজনকে দেখে সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ব'লে উঠলো, কি মিথ্যাবাদী তুমি চন্দনা! তোমার মৌসেরা বোন! মৌসেরাই বটে! হঠাৎ সে কমলার থুৎনিতে হাত

দিয়ে হিহি ক'রে হেসে উঠে বললে, মক্কার—কপট বঙ্গালিন্, মক্কার দেশসেবিকা, ঝুঠা মার্টর, দু'কড়ির মেয়ে! এখন তুমি আমার।

কমলার বাধা দেবার আগেই চন্দনা সজোরে স্বামীর হাতে আঘাত ক'রে চকিতে কমলাকে আড়াল ক'রে বসলো। ক্রুদ্ধস্বরে বললে, তুমি যাও বলছি এ-ঘর থেকে।

জরুর। যায়েঙ্গে মগর ইস্ অওরৎ কো সাথ লে যায়েঙ্গে। আও কম্‌লা। বৃথাই হার দিলুম তোমাকে অতি মূল্যবান ভেবে, যার দাম বড়ো জোর বিশমুদ্রা এক রাতের জন্য।

চন্দনা খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার ক'রে বললে, যাও, এখনো বলছি যাও। অপমান আমি ওকে হতে দেবো না।

বৃজবিহারী সরে গিয়ে একটা কুর্সিতে বসলো, বললে, আহা, চেঁচাও কেন? তোমার কম্‌লা বহন্‌কে যেতে হবেই, হয় আমার বুকে, না হয় কয়েদখানায়। নিজের বুকে হাত রেখে বললে, আমার বুকটাই বেহ্‌তর জায়গা, কম্‌লা। পুলিশ ঘুরছে এ-বাড়ির আশপাশে। একটু ইশারা, ব্যস্। তারাই তো আমাকে খবর দিলে, বললে, অতি খুবসুরৎ অওরৎ আছে আপনার বাবার বাড়িতে, যা-তার জন্য অন্যত্র ধাওয়া করেন কেন? চেহারার বর্ণনা দিলে। মিলিয়ে দেখলুম, তুমি—হূরী, পরী, দিল-লুভানেওয়ালী, মুঝে গলানেওয়ালী। বুড়ো ভবানীশঙ্কর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, পারি কেবল আমি।

বৃজবিহারী ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলার হাত মুঠো ক'রে ধ'রে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে। নিমেষে কমলা হাত ছাড়ালো, কিন্তু তার মধ্যে চন্দনাও বৃজবিহারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তাকে আঁচড়ে খাঁমচে ক্ষতবিক্ষত ক'রে সেই উন্মাদক্ষণলব্ধ অমিত-বলে ঘর থেকে টেনে বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগলো।

বাইরে থেকে বৃজবিহারী কুৎসিত একটা মন্তব্য ক'রে ব'লে গেলো, সকালে কোতওয়ালীতে তোমার বহন্‌কে দেখতে যেও চন্দন।

উপরে কোলাহল শুনে পদ্‌মা ঘরের বাইরে এসেছিলো। সিঁড়ির কাছে তার বৃজবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। বৃজবিহারী চোখ বিস্ফারিত ক'রে তাকে দেখে চমকে উঠলো। তার লোভাতুর দৃষ্টি দেখে পদ্‌মা তৎক্ষণাৎ তার ঘরের দরজা দিলে। বৃজবিহারী মুচকি হেসে তখনকার মতো চলে গেলো।

এ-ঘোর লজ্জার কথা চন্দনা ভবানীশঙ্করকে না ব'লে থাকতে পারলে না। কমলা গেলোনা, তার আর লজ্জার ঠাঁই ছিলো না। চন্দনা শ্বশুরকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে পাগলের মতো বকতে লাগলো। আমার স্বামী নেই অনেকদিন পিতার্জী। ছেলে ব'লে যাকে জানলুম সেও পাগল। আমার আশ্রিতেরও সম্মান গেলো, আর কি প্রয়োজন আমার বাঁচার।

ভবানীশঙ্কর ধীরস্বরে শুধু বললেন, কম্‌লাকে আমি বাঁচাতে পারবো, তোমার ভয় নেই চন্দন। এসো, দেখিয়ে দি কি ক'রে বাঁচাবো। ঘনায়মান ভবিতব্যের হাত থেকে আর কিছু রক্ষা পাবেনা বেটি।

বাড়িতে গিয়ে তিনি তাঁর খাটের নিচের গালিচা সরালেন। চন্দনা বিস্মিত হয়ে দেখলে, সেখানে মেঝে নেই, আছে লোহার চাদরের ডালা একটা। আংটায় টান দিতে ডালাটা উঠে এলো। নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে। ভবানীশঙ্কর বললেন, আমার পূর্বপুরুষদের নির্মাণ ক'রে যাওয়া এই তয়খানা সিঁড়ির নিচে। আগে ওটা গ্রীষ্মাবাস ছিলো, এখন হয়েছে সিন্দুক-ঘর। কেউ এর অস্তিত্ব জানে না। বহুকাল ধ'রে গৃহকর্তারা তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে এ-ঘরের কথা ছেলেদের ব'লে দিয়ে গিয়েছেন। বহুকাল ধ'রে তাঁরা এই ঘরে বাস করেছেন, আর কেউ ঢোকেনি এখানে। প্রয়োজন হলে কম্‌লাকে এখানে পাঠিয়ে দিও।

ভোরের আলো তখনো ভালো ক'রে ফোটেনি, বাড়িটা পুলিশ বাহিনী দিয়ে বেষ্টিত হয়ে গেলো। ভবানীশঙ্করের কাছে খবর গেলো। তিনি অম্লানস্বরে বললেন, বেশ, খোঁজ যেমন চাও। আমার আশ্রয়ে কম্‌লা ব'লে কেউ নেই। এই মিথ্যা কথাটা ব'লেই তিনি চমকে উঠলেন, হৃদ্‌পিণ্ড তাঁর বুকে মোচড় দিয়ে গেলো। চন্দনার কাছে আগেই খবর পৌচেছিলো। সে সারাটি রাত্রি রাস্তার পানে চেয়ে বসেছিলো। পুলিশ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো কয়েক ঘণ্টা ধ'রে, কিন্তু কমলার চিহ্নমাত্র পাওয়া গেলো না। কমলাকে চিনিয়ে দেবার জন্য পুলিশ পিয়ারীকে ধ'রে এনেছিলো। ভবানীশঙ্করকে দেখে সে মাথা নামালে।

সন্ধ্যায় কোতওয়ালীতে হাজিরা দেবার জন্য তাঁর ডাক এলো।

সম্ভ্রান্তের সম্ভ্রমের দিন ফুরিয়ে গেছে, ভবানীশঙ্কর সে-ডাকে বিস্মিত হলেন না। চন্দনা এ-সংবাদ পেয়ে কাঁদলো, অবিশ্রাম কাঁদলো বুক চাপড়ে। গভীর অন্তর্বেদনায় সারা বাড়িটায় উপর নিচে সে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ালো নিরবলম্ব প্রেতাত্মার মতো। সে-রাত্রিতে যেন দিগ্বলয় পর্যন্ত নিস্তব্ধ. কেবল কমলান্বেষী মৃতিকারের বাটালির শব্দ অমলিন অব্যাহত, ঠুক ঠুক ঠুক।

পরদিন সকালে ভবানীশঙ্কর ফিরে এলেন। তাঁর মাথা নোয়ানো, সম্ভ্রমের অদেখা কিন্তু অবিস্মরণীয় মুকুটটা আর নেই। চক্ষু তাঁর রক্তবর্ণ, মুখ পাণ্ডুর, একটি রাত্রির কদর্য অপমানে মলিন বিষণ্ন। তখন তাঁর দেহে জরার আক্রমণ মাখানো। খবর পেয়ে চন্দনা তাঁর কাছে গেলো। দেখলে, সেই পুরনো স্থানে বীরাসনে উপবিষ্ট তার শ্বশুর আর নেই, সেথায় বসে আছেন বসনমুক্ত দুই হাঁটুর উপর অসহায়ভাবে মাথা রাখা যেন আর কেউ। চন্দনার অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠলো, তার মুখে কথা ফুটলো না। ভবানীশঙ্করের পায়ে মুখ রেখে চন্দনা সে-পা বিগলিত অশ্রুধারায় বিধৌত ক'রে দিয়ে ক্ষিপ্রপদে চ'লে গেলো।

আনমনা ভবানী উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলেন। ভরা গঙ্গা সংসারের মান অপমান, জন্ম মৃত্যু, উত্থান পতন সব উপেক্ষা ক'রে কুলুস্বরে বয়ে চলেছে।

হঠাৎ দেখলেন ঘাটের পথে চন্দনা, সে ছুটে চলেছে। তিনি পিছু ডাকতে যাচ্ছিলেন, চন্দন বেটি! তাঁর জিভ জড়িয়ে গেলো।

রানার উপর থেকে চন্দনা ঝাঁপিয়ে পড়লো গভীর জলে। মুহূর্তের জন্য জলে একটা গহ্বর জাগলো ; বুদবুদে ঝাঁপিয়ে-পড়া জলে সে গহ্বর তৎক্ষণাৎ বুজে গেলো। সে-আবর্ত নিমেষে মিশলো অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায়।

ভবানীশঙ্করের পায়ে তখনো ছোটবার শক্তি অবশিষ্ট ছিলো, তিনি ছুটলেন। ঘাটে দাঁড়িয়ে ক্ষণেকের জন্য শান্ত জলপৃষ্ঠ দেখলেন, চন্দনা যেখানে ঝাঁপিয়েছিলো সেখানে আর চিহ্ন নেই কোনো। পুত্রবধূকে উদ্ধার করবার কথা মনে হয়ে হাঁকডাক করবার জন্য তিনি পিছন ফিরে পা বাড়ালেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার গঙ্গার দিকে ফিরলেন। অস্ফুট স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল, যাকে এই গঙ্গারই গর্ভে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে তার আর অন্বেষণ কেন!

ধ্বংসাভিমুখী জাহাজ থেকে যেমন ইতুরের দল পালিয়ে যায় সংস্কারে ধ্বংসের আগমন বুঝতে পেরে, চন্দনার মৃত্যুর তু'দিনের মধ্যে এই বিরাট বাড়িটার আশ্রিত পরিজন অন্তর্হিত হয়ে গেলো। দোতলাটাকে শুধু সরব ক'রে রাখলে, ঠক ঠক ঠক—শতাব্দীর অঙ্গে দাগ কাটা নিদ্রাহীন নিরলস ঘড়ি।

কমলা মূক হয়ে গিয়েছিলো। ভবানীশঙ্করের পায়ের কাছে ব'সে

সে অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টার পর বললে, এবার আমাকে বিদায় দিন পিতাজী। সর্বনাশ এনেছিলুম, পূর্ণ ক'রে দিয়েছি সর্বনাশের ডালা।

সত্যই বেটি, তুমি সর্বনাশ এনেছো। যখন প্রথম আসো, চমকে উঠেছিলুম। বুঝেছিলুম, তুমি চলা-পথ ত্যাগী নির্দেশহীন বনের নূতন যাত্রী, জীবন তোমাকে স্বীকার ক'রে নেবেনা, ফেলেই দেবে। বুঝেছিলুম, তুমি নূতন নির্ঝরিনী, দুর্গম গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথ খুঁজছো। আনছো শৃঙ্গের সর্বনাশ।

দু'শতাব্দীর এ-বাড়িটায় অনেক ক্লেদ বোধ করি জমে উঠেছিলো সর্বনাশের শয্যা হ'য়ে। নূতন কালের দাবীতে এটার মুছে যাওয়া, আমারও মুছে যাওয়া প্রয়োজন হয়েছে। তুমি এলে, বিধাতার লীলা ঘন হয়ে উঠলো। নির্বাক বিস্ময়ে সে-লীলা দেখছি। কম্‌লা তুমি একা যাবেনা, আমিও সঙ্গ নিলুম তোমার। ভেবেছিলুম, সন্ন্যাস নেবো না কোনোদিন, দুঃখশেষের ও আশ্রয়ে গা-ঢাকা দেবোনা। কিন্তু যেতে হলো। এ-দুঃখ আমিও না বহন করলে তুমি বাঁচবে না। বুঝছি সর্বনাশ পূর্ণ হয়ে এলো, নিয়তির কাজ মিটলো। শেষ আসছে সমগ্র বিনষ্টি। ওঠো কম্‌লা, যথাকালে তোমাকে গান্ধিজীর পায়ে পৌঁছে দেবো, যাঁর বিনম্র শান্তশ্রীতে তোমার বিষলগ্ন ক্ষয় হয়ে যাবে!

কমলা শেষবার চন্দনার ঘরে যাচ্ছিলো। সিঁড়িতে পদ্‌মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। হঠাৎ কমলাকে জড়িয়ে ধ'রে পরম দুঃখ

বিস্ময়ের স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, এ কী হয়ে গেছো কম্‌লা বহন্‌? তুমি কি সেই রূপসী কম্‌লা, আমার প্রতিযোগী?

এই প্রথম পদ্‌মা তাকে বহন্‌ ব'লে সম্ভাষণ করলে।
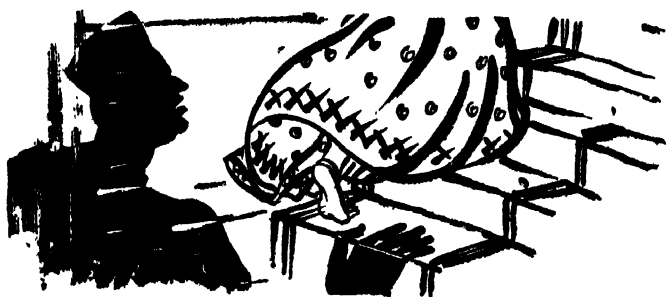
পদ্মার দাঁতে বেণীর ফিতা, চঞ্চল আঙুলে এলো চুলে বিনুনির গ্রন্থি-সাধনা। তার আঁচল ভূমিতে লোটানো, চোলিতে আন্দোলিত দেহের চলোর্মি। পদ্মার বৃহৎ দর্পণে বৃজবিহারীর ছায়া পড়লো। বুকে কাপড় তুলে দিয়ে পদ্মা মৃদু হাসলে, অর্ধরচিত বেণী তার পিঠে ফিরে গেলো। সে ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললে, তুমি লম্পটরাজ! আসবেই একদিন তা জানতুম, আর, সে-অপেক্ষাতেই ছিলুম। কিন্তু চন্দনার শ্বাস মুছে যাবার আগেই যে তোমার আসবার স্পর্ধা হবে তা ভাবিনি। বসো, আমি প্রসাধন সেরে নিই।

বৃজবিহারী পদ্মার কথার আত্মসুখকর অর্থ ধ'রে নিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে খাটের উপর আসীন হয়ে সিগারেট ধরালে।

পদ্মা নির্বিকার চিত্তে তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে চুলবাঁধা সমাপন করতে লাগলো। বৃজবিহারী তার প্রতি তন্ময় সম্মোহিত দৃষ্টি দিয়ে ব'সে রইলো। এক সময়ে আর থাকতে না পেরে সে দু'বাহু মেলিয়ে দিয়ে পদ্মার পিছনে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আয়নায়

পদ্মার অপূর্বসুন্দর চোখের দিকে চেয়ে মত্ত মদালস স্বরে ডাকলে, পদ্ম্।

দাঁড়াও। শেষ আসে দৌড়ে নয়, ধীর পায়ে, তৈরী হয়ে নিই আগে, তাহলে আরো বেশি পাবে, যে পাওয়া তোমার দৃষ্টি অন্ধ-করা, যে পাওয়ায় তোমার বিলুপ্তি। বৃজবিহারী ফিরে এসে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পদ্মা এলো ও-ঘর থেকে, লেহেঙ্গা চোলি ওড়নায় ধ্বংসরূপিনী। বৃজবিহারী মোহমুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকে দেখলে, তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ। পদ্মার কণ্ঠে দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, ও-হার তুমি কোথা পেলে পদ্মা?

কোথা পেলুম? কম্‌লা দিয়েছিলো।

কম্‌লা দিয়েছিলো? ওটা তো আমার দেওয়া তাকে!

সে কথা থাক। কি চাও তুমি? কি দেবে তার দাম?

চাই তোমাকে পদ্মা। দাম? কাল প্রাতে সাজিয়ে দেবো মণি-মাণিক্যে। তোমার দু'হাত ভরে দেবো দশ লাখ টাকা। না না, ক্রোড় টাকা দেবো যা কামিয়েছি। ঘট উপুড় ক'রে দেবো। দেবার মতো তুমি।

অতোটুকু মাত্র দেবে? আর নেই? আমার এই দেহটাকে আমি তিল তিল ক'রে, দিনে দিনে মন্দিরের মতো গড়েছি; তাকে রক্ষা ক'রে এসেছি। ভালোবাসা নয়, পূজার জন্য নয়, আকুতির দাবীর কারণে নয়, লম্পটের কামাগ্নিতে তা আহুতি দেবো মাত্র ক্রোড়

টাকার জন্য? অতোটুকু দামে? এ-দেহের ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বে দাম নেই বৃজবিহারী! আর কোনো দাম খতাও।

বৃজবিহারীর পদ্মার বক্ষে সন্নিবদ্ধ দৃষ্টি। চোখ তুলে সে কাতর স্বরে বললে, তোমার কথা বুঝছিনে, প্রসন্ন হও পদ্ম। কাল নয়, আজই চলো, সর্বস্ব নিবেদন করে দি তোমার পায়ে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মাকে জড়িয়ে ধরলে।

সবলে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পদ্মা বললে, এখানে নয়। চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে ওই। ছাতে চলো।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে পদ্মা আবার বললে, সত্য বলছো, আমাকে চাই? এখনো সময় আছে ফিরে যাবার। এ-দেহ তুমি সহ্য করতে পারবে না বৃজবিহারী। এখনো বাঁচতে পারো। অন্ধকারে পদ্মার চোখ জ্বলছিলো।

ছাতে উঠলো ওরা। শরতের আকাশে ভাস্বর ছায়াপথ, সপ্তর্ষি হাসছে ছাতের পানে চেয়ে। উন্মত্ত বৃজবিহারী পদ্মার উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে বুকে অজস্র চুম্বন করতে লাগলো। পদ্মা ক্ষণিকের জন্য নিজেকে তার আলিঙ্গনে ছেড়ে দিয়ে তাকে আরো অধীর উন্মত্ত ক'রে দিলে। তারপর নিজেকে বিচিত্র লীলায় মুক্ত ক'রে হাসির তরঙ্গ তুলে ছুটে বেড়াতে লাগলো। বৃজবিহারীও কেলি মনে ক'রে তার পিছনে ছুটলো।

হঠাৎ পদ্মা থামলো। বৃজবিহারী, ওই কালপুরুষের পানে তাকাও। ওকে সাক্ষ্য রেখে বলো, পরকালে আমাকে দোষ

দেবে না। আমার এ-দেহ তেত্রিশ কোটি দেবতাও তপস্যায় পেতো না, পেলে তারাও ধ্বংস হয়ে যেতো। তুমি সেই দেহে লম্পটের স্পর্শ মাখিয়ে দিয়েছো। এসো, নাও এই তুচ্ছ দেহটাকে।"

কেলি ছলে পদ্‌মা বৃজবিহারীকে একেবারে ছাতের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিলো। সেদিকটার পাঁচিল ভাঙা। বৃজবিহারী পদ্‌মাকে ধরতে গেলো। পাশে একটু স'রে এসে পদ্‌মা তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে। তারপর তৃপ্ত হাসিমুখে কান পেতে শুনলে অনেক নিচের মাটিতে একটা গুরু ভার পতনের শব্দ।

পদ্‌মা শেওলা-ঢাকা ছাতে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার ক'রে হাসতে লাগলো।

শ্মশান নয়, ***Annihilation's Waste***—সমগ্র বিনষ্টির প্রতীক হয়ে এই পুরনো প্রাসাদটা জেগে রইলো অগ্নিশেষে ভস্মের মতো।

অষ্টম শতাব্দীর মূর্তিকার কেবল তখনো অন্বেষণে রত। তার যাত্রাপথে সে পার হয়ে এসেছে ভিনস্ থেকে হ্যাথর, হ্যাথর থেকে রতি, রতি থেকে কৌমারী, আর তখনো চলেছে কমলার উদ্দেশ্যে—ঠুক ঠুক ঠুক।

•

আর আছে পদ্মা—কঙ্কালসার কুৎসিত ভয়াবহ প্রেতিনী। লম্পটের চুমা তাকেও ধ্বংস ক'রে গেছে। পদ্মা দিবাকালে সতীশের সেবা করে; আর, রাত্রে লেহেঙ্গা চোলি ওড়না হীরা-মানিকে সজ্জিতা এক প্রেতিনী ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়িটায়। তার আশেপাশে বুঝি বা ওদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মারাও ভিড় করে আসে।

বহুদূরে বালিয়ার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় এক অকালজীর্ণ রমণী। আকাশের দিকে ম্লান মুখ তুলে বিড়বিড় ক'রে বলে, তোমাকে স্মরণ ক'রে তার নাম রেখেছিলুম দয়ানন্দ। এই কি তোমার দয়ার আনন্দ, পরমেশ্বর?

প্রকাশ ও অপ্রকাশের আলোছায়ায়
পাওয়া ও না-পাওয়ার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে
কামনা ও কবিতার টানা-পোড়েনে
যে রহস্যজাল রচিত হয়েছে তা দুর্লভ কারুশিল্প

শচীন্দ্র মজুমদার

লীলামৃগয়া

উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কত মধুর হতে পারে এ বইয়ে তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। সংস্কৃত কাব্যের গাম্ভীর্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য এর প্রতি ছত্রে উৎসারিত। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এ-উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন — সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়া-প্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম তিন টাকা।

সিগনেট প্রেসের বই

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা

সিগনেট প্রেসের বই * সিগনেট প্রেসের বই * সি